প্রথম প্রকাশ ঃ
নভেম্বর ১৯৬০
গ্রন্থস্বত্ব ঃ
শ্রীমতী জয়ন্তী দে
প্রকাশক ঃ
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১৯এ, কেদার বসু লেন
ভবানীপুর
কলকাতা-৭০০০২৫
প্রচ্ছদ ঃ
শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
ইম্প্রেশন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রণ ঃ
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন
ভবানীপুর
কলকাতা-৭০০০২৫

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রস্তুতিপ্রসঙ্গ

কবি জীবনানন্দ দাশ এবং একালের তরুণকবি জয় গোস্বামী বর্তমান সংকলনের তুই প্রান্তসীমা। সকলেই মানবেন অর্ধশতকের এই সময়সীমায় বাংলা কবিতা নতুন নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে—ভাষার প্রকাশসীমানা প্রসারিত হতে হতে দিগন্ত স্পর্শ করেছে। এখন আমাদের মনন-চর্চায় দর্শন, উপন্যাস, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের তুলনায় কবিতার প্রাসঙ্গিকতা কিছু কম নয়।

একালের কবিতার বৈচিত্র্য ও গভীরতা একটি সংকলনের পরিসরে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও আমরা করিনি। আমাদের সংকলনের বাইরে অনেক উজ্জ্বল কবি রয়ে গেলেন। আমাদের যেটা উদ্দেশ্য তা হল নির্বাচিত শতেক কবির মাধ্যমে ৫০ বছরের কবিতার একটি প্রবাহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। ঘাট না থাকলে যেমন নদীর প্রবাহ বোঝা যায় না, দশক শব্দটিও আমরা অনুরূপভাবেই ব্যবহার্য মনে করি। সংকলনের সূচীপত্রে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত কবিরা বয়সের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত। দশকের ভাগটা প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ষাটের দশকের সূচক কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক থেকে। তেমনি আরেকটা ভাগ স্পষ্ট হয়েছে সত্তর দশকের নির্মল বসাক থেকে। কারণ তুটি ক্ষেত্রেই বয়সের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত।

কবিতা চেয়ে যে-কবিদের মুখোমুখি হয়েছিলাম তাঁদের প্রতি উষ্ণ কৃতজ্ঞতা। আর যে-সব কবির অনুমোদন নেবার আগেই সংকলন দিনের আলোর মুখ দেখল, তাঁদের মার্জনা পূর্বাহ্ণেই যাচ্ঞা করে রাখি। শুভমস্তু।

দিনেশ দাস

রমাপ্রসাদ দে

আধুনিক কবিতার কালপঞ্জি

১৮২১ প্যারিসে বোদলেয়ারের জন্ম

১৮৪২ প্যারিসে স্তেফান মালার্মের জন্ম

১৮৪৩ ৩৬ বছর উন্মাদ অবস্থায় কাটিয়ে হোল্ডার্লিনের মৃত্যু

১৮৪৪ জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের জন্ম

১৮৪৬ এডগার এলান পো : A Philosophy of Composition

১৮৪৮ মার্ক্স ও এঙ্গেলস : Manifesto of the Communist Party
হাইনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত
পো: The Poetic Principle

১৮৪৯ ৪০ বৎসর বয়সে পো-র মৃত্যু

১৮৫৩ জেরার দ্য নের্ভাল তৃতীয়বার উন্মাদ

১৮৫৪ শার্লভিল শহরে আর্ত্যুর র‍্যাঁবোর জন্ম

১৮৫৫ হুইটম্যান : Leaves of Grass
নের্ভাল এক সরাইখানায় গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন

১৮৫৬ প্যারিসে হাইনের মৃত্যু
ফ্রয়েডের জন্ম

১৮৫৭ বোদলেয়ার : Les Fleurs du mal (ক্লেদজ কুসুম)—বারোটি কবিতা। সম্পূর্ণ সংস্করণ ১৮৬৮

১৮৬১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম

১৮৬২ ফরাসী চিত্রকলায় ইমপ্রেশনিজমের সূচনা

১৮৬৫ উইলিঅম বাটলার ইয়েটসের জন্ম ডাবলিনে

১৮৬৭ কার্ল মার্ক্স : Das Capital
বোদলেয়রের মৃত্যু

১৮৬৯-৭৩ র‍্যাঁবোর কবিতা। ১৮৭৩-এ শেষ করেন Une Saison En Enfer

১৮৭০-৯৪ মালার্মে প্যারিসের 'লিসে'তে শিক্ষকতা করছেন

১৮৭১ র‍্যাঁবো প্যারিসে।
পল ভালেরির জন্ম

১৮৭৩ ভের্লেন গুলি করলেন র‍্যাঁবোকে। কব্জিতে লাগল। ভের্লেনের দু'বছরের জেল

১৮৭৪ র‍্যাঁবো কবিতা লেখা বন্ধ করে ভ্রমণের জীবন বেছে নিলেন

প্যারিসে প্রথম 'ইমপ্রেশনিস্ট' প্রদর্শনী

মালার্মে : La Derniere Mode

১৮৭৫ প্যারিসে রাইনের মারিয়া রিলকে-র জন্ম

১৮৭৯ আইনস্টাইনের জন্ম

১৮৮০ র‍্যাঁবো আফ্রিকায়

আলেকজাণ্ডার ব্লকের জন্ম

রোমে গীয়োম আপলিনের জন্ম নিলেন

১৮৮১ হুয়ান রামোন হিমেনেথের জন্ম আন্দালুশিয়ার মোগের শহরে

লাফর্গের মুক্ত ছন্দের প্রবর্তন (১৮৮১-৮৬)

১৮৮৪ পল ভের্লেন : Les poetes maudits ("অভিশপ্ত কবিরা"—র‍্যাঁবো ও মালার্মে সম্পর্কিত)

১৮৮৫ আমেরিকার ইডাহো স্টেটের অন্তর্গত হেলিতে এজরা লুমিস পাউণ্ডের জন্ম

ডি. এইচ লরেন্সের জন্ম

ভিক্তর উগোর মৃত্যু

কিউবিজমের জন্ম (১৮৮৫-৮৭)

১৮৮৬ গটফ্রিড বেনের জন্ম ম্যানসফিলডে।

গুস্তাভ কান, জাঁ মরেসাস ও পল আঁদ কর্তৃক 'সিম্বলিস্ট' পত্রিকা পরিচালনা

র‍্যাঁবোর রচিত মুক্তছন্দের (vers libre) কবিতা। কবিতাগুলো ১৮৭৩-এর আগে লেখা

১৮৮৭ মালার্মে : Poe'sis (১৯৬২ থেকে লেখা কবিতাবলী)

স্যাঁ-ঝন পের্সের জন্ম

ট্রাক্ল-এর জন্ম

ইয়েটস ও আর্নেস্ট রীস-এর 'রাইমার্স ক্লাব' স্থাপন

লাফর্গের মৃত্যু

১৮৮৮ টি এস এলিঅটের জন্ম

১৮৮৯ মালার্মে-কৃত পো-র কবিতার অনুবাদ
হেনরি বের্গস : Essai sur les donne'es imme'diates de la conscience
ভালেরির প্রাথমিক কবিতাগুচ্ছ (১৮৮৯-৯৩)—এরপর ১৯১৭ পর্যন্ত তিনি আর লিখলেন না
১৮৯০ আর্থার সিমনস্ : The Symbolist movement in Literature
বুকে গুলি চালিয়ে ভ্যান গ'র আত্মহত্যা
পাস্তেরনাকের জন্ম
১৮৯১ র‍্যাঁবোর মৃত্যু
গোগ্যাঁ তাহিতি দ্বীপে
ভালেরি মালার্মের সঙ্গে দেখা করলেন
১৮৯৩ মায়াকভস্কির জন্ম
১৮৯৪ রুশ কাব্যে প্রতীকিতার আরম্ভ
অবসরপ্রাপ্ত মালার্মে ইংল্যাণ্ডে বক্তৃতা দিলেন
ই. ই. কামিন্সের জন্ম
১৮৯৫ পল এল্যুআরের জন্ম। ইয়েটস : Poems.
সেজানের স্টিল লাইফ পর্যায় (১৯০০ পর্যন্ত)
১৮৯৬ প্যারিসে ভের্লেনের মৃত্যু
গোগ্যাঁ তাহিতি দ্বীপে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন
জেনোয়ার উজেনিও মনতালের জন্ম
১৮৯৭ মালার্মে : Divagations (১৮৬৪ থেকে লেখা গদ্যকবিতা এবং কবিতা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন)
লুই আরাগ'র জন্ম।
১৮৯৮ মালার্মের মৃত্যু।
আপলিনের ও স্যাঁ-ঝন পের্স প্যারিসে এলেন
১৮৯৯ স্পেনের গ্রানাদার কাছে ফোএন্তে ভাকেরোস গ্রামে ফেদারিকো গারথিআ লোরকার জন্ম
বাংলাদেশের বরিশালে জীবনানন্দ দাশের জন্ম
রিলকে রাশিয়ায়
১৯০১ সালভাতোরে কোয়াজিমোদোর জন্ম

১৯০১ সুধীন্দ্র নাথ দত্তের জন্ম
অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম

১৯০২ রাফায়েল আলবের্তি'র জন্ম
রিলকে প্যারিসে রদাঁর সংস্পর্শে এলেন

১৯০৪ পাবলো নেরুদার জন্ম
লেডি গ্রেগরি ও ইয়েটস ডাবলিনে 'অ্যাবি থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করলেন
সি. ডি. লুইসের জন্ম
প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম

১৯০৫ গীয়ম আপলিনের ও পাবলো পিকাসোর মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত
ফ্রয়েড : Three Contributions to the theory of Sex
আপেক্ষিকতার প্রথম বিবৃতি প্রকাশ করলেন আইনস্টাইন

১৯০৭ ডব্লু. এইচ. অডেনের জন্ম
রনে শার জন্ম

১৯০৮ আপলিনের : L'Enchanteur Pourrissant (পচতে থাকা যাদুকর)
বুদ্ধদেব বসুর জন্ম

১৯০৯ মিলানে ফিলিপ্পো মারিনেত্তির Futurist Menifesto প্রকাশ
স্টিফেন স্পেণ্ডারের জন্ম
বিষ্ণু দে ও অরুণ মিত্রের জন্ম

১৯১০ জার্মান প্রকাশবাদ (expressionism)—১৯২০ পর্যন্ত

১৯১১ স'্যা-ঝন পের্স : Eloges
ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের জন্ম

১৯১২ এজরা পাউণ্ডের উদ্যোগে আমেরিকার 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশ
ইওনেস্কোর জন্ম
মায়াকভ্স্কির ভবিষ্যদ্বাদী ঘোষণাপত্রের (জনরুচির মুখে থাপ্পর) প্রকাশ
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর
উগারেত্তি ঈজিপ্ট ছেড়ে প্যারিসে চলে এলেন—আপলিনের তাঁর বন্ধু হ'ল
বেন : Morgue

১৯১৩ রবীন্দ্রনাথের নোবল পুরস্কার লাভ
এজরা পাউন্ড ও টি. ই. হিউমের নেতৃত্বে ইমেজিস্ট আন্দোলন
প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' প্রকাশ
এল্যুআরের প্রথম কবিতাগুচ্ছ
আপলিনের : Alcools (Zone-এর অনুবৃত্তি)

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
উগারেত্তি ইটালিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন
ট্রাক্ল-এর মৃত্যু
ডিলান টমাসের জন্ম

১৯১৫ বার্লিনে ভারত স্বাধীনতা কমিটির সংগঠন
গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন

১৯১৬ জুরিখে দাদাবাদের প্রতিষ্ঠা

১৯১৭ রুশ বিপ্লব ও বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল
ভালেরি : La Jeune Parque (তরুণী নিয়তি)

১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান (১১ই নভেম্বর)
আপলিনের : L 'Esprit nouveau et les Poetes (নতুন চেতনা ও কবিরা'—বক্তৃতা)
আপলিনের : Calligrammes
ইনফ্লুয়েঞ্জায় আপলিনের মারা গেলেন

১৯১৯ গিলেন কবিতা লেখা শুরু করলেন
উগারেত্তি : L'allegria
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড
প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'স্যর' উপাধি প্রত্যাখ্যান
রম্যাঁ রলাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ La declaration pour l'indipendence de l'esprit-এ স্বাক্ষর করলেন

১৯২০ ভালেরি : Album des vers anciens.

১৯২১ গারথিআ লরকা : Libro de poems
ভালেরি : Charmes
আলেকজাণ্ডার ব্লকের মৃত্যু

১৯২২ টি. এস. এলিঅট : The West Land
প্রুস্তের মৃত্যু
গারথিআ লোরকা : Poema de cante jondo
ভালেরি : Charmes

১৯২৪ প্রথম স্যররেআলিস্ত ঘোষণাপত্র (আদ্রে ব্রতোঁ)
এল্যুআর : Mourir de ne pas mourir

১৯২৪ আলবের্তি : Marinero en tierro
গারথিআ লোরকা : Canciones
Revolution surre´alists পত্রিকা প্রকাশ
স্যাঁ-ঝন পের্স : Anabase

১৯২৫ এজরা পাউণ্ড : Cantos

১৯২৬ রিলকের মৃত্যু
এল্যুআর : Capital de la douleur

১৯২৭ টি. এস. এলিঅট বৃটিশ নাগরিকত্ব নিলেন
বেন : Gesammelte Gedichte I

১৯২৮ মনতালে : Ossi di Seppia
আলবের্তি : Sobre los a´ngeles
গিলেন : Ca´ntico
গারথিআ লোরকা : La imagen po´etica en Don Luis de Gongora (বক্তৃতা, ছাপা হয় ১৯৩২-এ)

১৯২৯ গারথিআ লোরকা নিউইয়র্কে এসেছেন : কাব্যগ্রন্থ Poeta en Nueva York-এর জন্য কবিতা লেখা চলছে।
(বইটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪০-এ প্রকাশিত হয়)
এল্যুআর : L'amour la poe´sie

১৯৩০ প্যারিসে ভালেরি দেখা করলেন রবীন্দ্রনাথের সাথে
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর উদ্যোগে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনী
জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একক ইংরেজি কবিতা The child রচনা করলেন
রবীন্দ্রনাথের রাশিয়াভ্রমণ

১৯৩১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ

১৯৩২ কাব্যসংকলন : New Signature (অডেন, সিসিল ডে লুইস, স্টীফেন স্পেণ্ডার, লুই ম্যাকনিস প্রমুখের কবিতা)
রবীন্দ্রনাথ : পুনশ্চ
এল্যুআর : La Vie imme´diate

১৯৩৩ এফগেনি এফতুশেংকোর জন্ম

১৯৩৪ দ্বিতীয় সুররেআলিস্ত ঘোষণাপত্র (ব্রতোঁ)

১৯৩৫ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ

১৯৩৫ গারথিআ লোরকা Llanto por Ignacio Sa'nchez Mejias (ইগনাথিও সানচেথ মেহিআসের উদ্দেশে শোকগাথা)
উগারেত্তি : Sentimento del tempo
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : অর্কেষ্ট্রা

১৯৩৬ স্পেনের গৃহযুদ্ধে গারথিআ লোরকা নিহত
বেন : Angevahlte Gedichte
লুই শুনের মৃত্যু
জীবনানন্দ : ধূসর পাণ্ডুলিপি

১৯৩৮ ভালেরি Introduction a La poe'tique
বিষ্ণু দে : চোরাবালি
অমিয় চক্রবর্তী : খসড়া
দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতা প্রকাশিত হল। অগ্রজ কবিদ্বয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে কবিতাটির 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' উদ্ধৃতি দিয়ে দুটি কবিতা লিখলেন

১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
ইয়েটসের মৃত্যু
মনতালে : Le occasioni

১৯৪০ স'া-ঝন পের্স যুক্তরাষ্ট্রে এলেন
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক

১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু

১৯৪২ লুই আরাগঁ : Les Yeux d'Else
স্যাঁ-ঝন পের্স : Exile
জীবনানন্দ ; বনলতা সেন
কোয়াজিমোদো : Ed e subito sera
ইগর স্ত্রাভিন্স্কি : Peotics of Music

১৯৪৪ আলবের্তি : Poesia (১৯২৪-১৯৪৪)
টি এস, এলিঅট : Four Quartets
জীবনানন্দ : মহাপৃথিবী

১৯৪৫ পারিসে ভালেরির মত্যু
বাংলায় 'তেভাগা' আন্দোলন শুরু

১৯৪৬ প্রেভের : Paroles (কথা)

১৯৪৭ ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতা
রনে শার : Le poeme pulve'rise'
বিষ্ণু দে : সন্দীপের চর

১৯৪৮ মহাত্মা গান্ধী নিহত

বুদ্ধদেব বসু : An Acre of Green Grass.

বিষ্ণু দে-র সাহিত্যপত্রের প্রকাশ

জীবনানন্দ : সাতটি তারার তিমির

১৯৫০ ব্রতোঁ : Anthologie de l'humour noir

১৯৫২ এল্যুআরের মৃত্যু

১৯৫৪ ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জে ট্রাম দুর্ঘটনায় জীবনানন্দ আহত হন এবং ২২ অক্টোবর রাত্রি ১১টায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মারা যান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : নীল নির্জন

১৯৫৬ হিমেনেথের নোবল পুরস্কার লাভ

১৯৫৭ সাঁ্যা-ঝন পের্স : Amers

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ (প্রবন্ধ)

অরুণ মিত্র : উৎসের দিকে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ফুল ফুটুক

১৯৫৮ পুয়েের্তোরিকোয় হিমেনেথের মৃত্যু

১৯৬০ সাঁ্যা-ঝন পের্স : Chroniques (বৃত্তান্ত)

প্রেমেন্দ্র মিত্র : হরিণ চিতা চিল

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু

সূচীপত্র

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।

—মধুসূদন দত্ত



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯)

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে ; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার :
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধুসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা

নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ— মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে ; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে ;
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল
পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে ;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে ; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো-এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা ;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির :
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায় ; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে ।
কি বুঝিতে চাই আর ?……রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনদিন আর জাগবো না জেনে
কোনদিন জাগবো না আমি—কোনদিন জাগবো না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে,
রয়েছে যে অগাধ ঘুম,
সে-আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন ;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই ।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;
এই সব ভয়াবহ আরতি !

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠবো না আর ;
তাকিয়ে দেখবো না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে ।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো—ধীরে—পউষের রাতে—
কোনদিন জাগবো না জেনে—

কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন আর ।

শব

যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শবের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে-খুঁটে খায়

সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;
নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হ'য়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে-নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে দ্যাখো যদি ;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রুপালি নীরব।

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত ;
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে ;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে ;
এক-একবার মনে হচ্ছিলো আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতিতারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে !
কাল এমন চমৎকার রাত ছিলো।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো—আকাশে এক তিল
ফাঁক ছিলো না ;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি ;

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা ;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ !
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।

যে-নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে ;
যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরআকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?
আড়ষ্ট—অভিভূত হ'য়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল ;
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে সাঁইসাঁই ক'রে,
সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট
সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়।

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

এই সব দিনরাত্রি

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই ;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ;
শরীর বিবশ হ'লে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের
কংগ্রেসের মতো কোনো আশা হতাশার
কোলাহল নেই।

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা তবু মৃত নয় ; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।
নামগুলো কুশ্রী নয়, পৃথিবীর চেনা-জানা নাম এই সব।
আমরা অনেক দিন এ-সব নামের সাথে পরিচিত ; তবু,
গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে ফেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে ;
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে ;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে !

মেডিকেল ক্যাম্বেলের বেলগাছিয়ার
যাদবপুরের বেড কাঁচড়াপাড়ার বেড সব মিলে কতগুলো সব ?
ওরা নয়—সহসা ওদের হ'য়ে আমি
কাউকে শুধায়ে কোনো ঠিকমতো জবাব পাইনি।

বেড আছে, বেশি নেই—সকলের প্রয়োজনে নেই।
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।
বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধ'রে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোন্ দিকে ?
জানু ভেঙে প'ড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল
হ'য়ে কিছু চায়—কিছু খোঁজে ;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই।

তাদের আকাশ
সর্বদাই ফুটপাতে ;
মাঝে-মাঝে এম্বুলেনস্ গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে
ফিরে আসে
যেন এক অসীম আকাশে।

এ-রকম ভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তবে
অনেক বেডের প্রয়োজন ;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে ;
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।
হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন,
কিংবা যারা মরণের আগে মৃতদের
জাতিধর্ম নির্বিচারে সকলকে—সব তুচ্ছতম আর্তকেও

শরীরের সান্ত্বনা এনে দিতে চায়,
কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ ক'রে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।
মানুষের অনিঃশেষ কাজ চিন্তা কথা
রক্তের নদীর মতো ভেসে গেলে, তারপর, তবু, এক অমূল্য মুগ্ধত
অধিকার ক'রে নিয়ে ক্রমেই নির্মল হ'তে পারে।

ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন
জানে জীবনের মানে: সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ-কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে
শুনেছি একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারী
কেমন আশ্চর্য গান গায়;

বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায় ;
গানের ঝংকারে যেন সে এক একান্ত শ্যাম দেবদারু গাছে
রাত্রির বর্ণের মতো কালো-কালো শিকারী বেড়াল
প্রেম নিবেদন করে আলোর রঙের মতো অগণন পাখিদের কাছে ;
ঝর্ ঝর্ ঝর্
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত ক্লেদরক্ত বৃষ্টির ভিতর
এ-পৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস
শঠতা রিরংসা মৃত্যু নিয়ে
কেবল প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সংগীতে
মুখের ব্যাদান সাধ দুর্দান্ত গণিকালয়—নরক শ্মশান হ'লো সব।
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথিবীকে এ-রকম ভাবে অনুভব
আমিও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে
বিকেলে—রাত্রির পথে হেঁটে :
দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে
আমরা অঙ্গার রক্ত : শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে।

এ-আগুন এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো ?
তবুও সকল কাল শতাব্দীকে হিসেব নিকেশ ক'রে আজ
শুভ কাজ সূচনার আগে এই পৃথিবীর মানবহৃদয়
স্নিগ্ধ হয়—বীতশোক হয় ?
মানুষের সব গুণ শান্ত নীলিমার মতো ভালো ?
দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১)

শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে, আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী ;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ।।

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে ।।

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে :
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে ;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে ।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে :
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে ।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম :
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে :
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;
কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে ।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ।।

কাস্তে

আকাশে উঠেছে কাস্তের মত চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকাল আসতে আসতে ?
স্ফীত ধমনীতে ঘোরে অনামিক শঙ্কা ;
হৃদয়ারণ্যে বাজে বর্বর ডঙ্কা ;
ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা
নির্বাণ সূর্যাস্তে।
হঠাৎ হাওয়ায় হাতুড়ির প্রতিবাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ
মানা করে ভালোবাসতে।
সংগমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা ;
ক্রমায়াত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা ;
আসে সে-বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা,
দাঁতাল হাসি হাসতে।
চৈতী ফসলে শটিত শবের স্বাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
নিষ্পতিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ
বাধা দেয় বানে ভাসতে।
আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে ;

শান্তি জীবন্মৃত্যুর ঔদাস্যে ;
স্বার্থসিদ্ধি সাক্ষীর স্মিত আস্যে
উঞ্ছ ঠাসতে ঠাসতে ।
বিকল প্রেমিক আমাদের প্রভুপাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ।।

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ।
কল্পান্তের অনিকাম অবসাদ
ব্যাপ্ত স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে ।
শুষ্ক ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন বিষ্ণু ;
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু ;
চিনেও চেনে না স্বালম্বী অসহিষ্ণু
সমবায়ী অপরাস্তে ।
খণ্ডাবে কবে অমৃতের অপরাধ
কালপুরুষের কাস্তে ?

সোহংবাদ

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত :
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দূরান্ত তারার
উধাও মনের আগে ; মাতরিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলায় যে-কর্মফল, তা আমরাই বুভুক্ষাজনিত ;

যেহেতু প্রশ্রয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত
হিরণ্ময় পাত্র, তথা দুর্নিরীক্ষ্য পুষার কারায়
স্বরাট্ স্বরূপ লুপ্ত ; দেশ-কাল আমাতে হারায়,
অথচ অন্বিষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত ।।

অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন : শূন্য দৃষ্টি স্বতই স্বগত ;
অসহায় অন্ধকারে কিন্তু কোথা আত্মপরিচয় ?
গচ্ছিত জাড্যের ভারে অনিকাম জঙ্গম জগৎও ;
জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনানিচয় ।।

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে ;
সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দুনে ।।

নৌকাডুবি

শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে :
চক্রবালে শুভ্র মেষপাল
নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে : কদাচিৎ খোঁড়ায় রাখাল
স্নিগ্ধ বনান্তরে ।।

খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙা হাটে শুরু,
পায়ে-চলা পথে কে একাকী ?
দু চোখে সোনার স্বপ্ন ; পসরার ফাঁকি আর বাকী
সহসা অগুরু ।।

কিন্তু বেলা প'ড়ে আসে : দ্রুত উবে যায়
মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ :
নির্ভার আবহে স্ফূর্ত অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ
পৃথিবী ডোবায় ।।

নৌজীবী অগত্যা পান্থ ; অনন্য সম্বল
মজ্জমান সাধের তরণী :
উত্তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাসে তাই তার সমগ্র ধরণী,
উদ্বৃত্ত মঙ্গল ।।

অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক :
অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা ;
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক ।।

তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে,
হবে স্বাভাবিক ।।

নষ্ট নীড়

কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে,
কুলায় খোঁজে শুক :
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ ।
কেবলই দূর মুখর তবু পবনে
কোথায় যেন নিবিদ বলে যবনে ;
চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে
কালের কৌতুক ।
বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধীরে ঝাড়ে
কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক ।।

কখন ওঠে, পাতালভেদ ক'রে,
অসম্ভৃত অমা :
বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে ;
দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা ।
জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসও,
তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশ ;

মোনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,
স্বয়ংবর প্রমা।
তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে
মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা ?

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১)

সমুদ্র

নীল কল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চে-পড়া। শব্দের ভিড়ে
পুরোনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।
নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে
দ্বীপ ভাঙে ; পাহাড়, প্রবালপুঞ্জ, নূনযন্ত্রে
ঘর্ঘর ঘোরায়। ধোঁয়া নেই। নব্যতন্ত্রী
ঐটুকু। আকাশের কারখানা ঢাকা ডাইনামো,
শব্দ নেই। রাত্রে বারান্দায় ভাবি সমুদ্র কখন হবে শম।

ভিতর মহলে চুপ, জ্বলন্ত রঙীন চুপ.
আদিম মাছের টবে। হয় লোপ
গতির তাণ্ডবে গতি। মেঘ, বাষ্প, নদীর সঞ্চার
প্রচণ্ড পর্যায়-কলে বাঁধা। ঢেউ উঠে নিরন্তর।।

তরল চলন্ত ঘরে অগ্নি কোথা ? চাঁদ সূর্য উঁকি দেয়,
রুদ্ধ বেগ চুরি ক'রে জাহাজ চালাই ; কোথা রয়
কয়লা তেলের ঘাঁটি তব ? মালয়, বোর্নিয়ো, দূর
পৃথিবীর বুক ছেঁড়ে কয়লা-তেলের অগ্নি-চোর।

কাড়াকাড়ি কলের কবলে। 'মেরিকায়, চীনে, পূর্ব হতে
হানাহানি য়ুরোপ ঘিরে। দেখো, প্রলয় জলের কল-পতি,
প্রতিদ্বন্দ্বী তব। দ্বন্দ্বী? লোকালয়ে স্বার্থের সংঘাত
সমুদ্রের স্বার্থ নেই, অর্থ নেই: ছোঁয় কোথা দু-জগৎ?

মেরুতে বরফ ঢেউ তব; আবর্ত গরম কোথা? নিয়ম-জলের অন্ধ বুকে
তবু নিয়ন্ত্রিত ঝড়; স্রোত ঘোরে; মনসুন। দেখি তট-চোখে
মেশিন-রাজ্যের সীমা। বাসনা কলেতে মন ডাঙা-'পরে
হাবুডুবু খায় বুদ্ধি-ভরে। কারখানা সব কার? প্রশ্ন হাওয়ায় যায় উড়ে।।

বড়বাবুর কাছে নিবেদন

তালিকা প্রস্তুত:
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নির্বাসিত কেরানি।

বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।
যার একখণ্ড এই ক্ষুদ্র চাক্‌রের আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।
আপনজনকে ভালোবাসা,
বাংলার স্মৃতি দীর্ণ বাড়ি-ফেরার আশা।

তাড়াও সংসার, রাখলাম
বুকে ঢাকলাম

জন্মজন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়
তুলসীমণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়
থার্ডক্লাসের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
সুন্দর ফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা;
গঙ্গার ভরা জল, ছোটো নদী; গাঁয়ের নিমছায়া তীর
—হায় এও তো ফেরা-ট্রেনের কথা।

শত শতাব্দীর
তরু-বনশ্রী
নির্জন মনশ্রী:
তোমায় শোনাই, উপস্থিত ফর্দে আরো আছে—
দূর-সংসারে এল কাছে,
বাঁচবার সার্থকতা।।

হাওয়া

হাওয়ার জোর। বড়ো বড়ো হাওয়া
গাছ ওপড়ায়, সমুদ্র ঝাঁকায়, যাতায়াত
করে দৈত্য তবু দেখা যায় না। আশ্চর্য।
কম বহুদূর হাঁটে না শূন্যে। আবার ছোটো হাওয়া
নিশ্বাসে; জুঁইফুলের চারধারে,
কচি কুঁড়ি নাড়ে, মোমবাতির আলো ঠেলে,
প্রাণ দিয়ে প্রাণের বাহিরে যায়; রাঙা তরঙ্গ,
দাবানলে তার নৃত্য। শুনি বাঁশিতে। আশ্চর্য।

হাওয়াকে কাজে বাঁধি, বিদ্যুৎপাখায়,
শীতদেশে করি তপ্ত, জমাই বরফের শ্বাসে,
আমাদের বন্দী। স্বেচ্ছাবন্দী দেহে প্রাণবায়ু
তবু দেখো আমাদের চেয়ে বেশি, ব্যাপ্ত অনাদ্যন্ত।
শূন্য আর হাওয়ার সম্বন্ধ।
তাই নিয়ে জীবন আজীবন মাটির তারায় ;
মুহূর্তে মুহূর্তে হাওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ আজীবন।
বহে যায় মরুর শিমুম রৌদ্ররাগী ;
কখনো গহন গাছের মর্মরে অনুলাপে ;
পেঁছিয় হিমকৈলাসে, নামে গঙ্গামাতৃক লোকালয়ে
আশ্বিনের দরজায়। শুভ্র শঙ্খের হাওয়া। শ্লোকোত্তরা।
প্রাণপ্রকাশের আকাশ। এবং ছন্দ। এবং গতি। আশ্চর্য।।

বাসা বদল

পেয়ালা ও প্লেট :
রাত্রে এসে রান্নাঘরে দাঁড়াই কোথায়, সাক্ষী ওরা
সাক্ষী আমি, মাথা হেঁট—
নিঃশব্দ পসরা
ফিকে সবজি। চেনা চায়না। কতদিন চেনা
চায়ের আসরে কবে হঠাৎ উৎসবে
কারু পাত্রে ভরেছিল আনন্দ প্রহর
আলোর জহর—
নিভৃত সংসারে সে কি বুদবুদের ফেনা
ভাসবে নিয়নে-জ্বলা ম্লান সন্ধ্যাস্রোতে
আরব্ধ ভূমিকা শেষ হতে নাই হতে।

অমিয় চক্রবর্তী

নমস্কার।
নম্র গ্যাস স্টোভ ; সুইচ্, বিনীত তৎপর বিজলি-ধার :
দেয়ালে ঝোলানো সারি কাঁটা-ছুরি ; ফ্রিজ্,
হলদে, ঠাণ্ডা ; পাশে জানলা, বস্টন-কেম্ব্রিজ
পরদার আড়ালে চিত্রবৎ।
ছিল কত ধোয়া আর মাজা
সাবানে গরম জলে ; চামচে, ডেক্‌চি সাজা
ওদিকে বসার ঘরে বন্ধুর সংগৎ।
পেয়ালা ও প্লেট
কৃতঘ্ন কালের প্রান্তে ভেঙে যাওয়া সেট্—
ভোর হলে
ট্রাক আসবে, সবই নেবে, আমরাও যাব সঙ্গে চ'লে ।।

সন্ধি

এদিকে
ব্যাপার শীতের গরম র‍্যাপার
ব্যবসা : বিষম প্রয়োজন কেরোসিন ওজন
করছি,
লঙ্কা তিসির থলি সুদের দোকানে ভরছি—
হাটে চড়ি মন্দি তারি অন্ধিসন্ধি অনিশ্চয়
সঙ্গে নিয়ে চলি শ্যামবাজারের অদ্বিতীয় গলি
নিলামের জুতো জামা ফিতে চাঁদনিতে : ঘুরে মরছি-
ঘুঁটের ধোঁয়ায় সন্ধ্যা হয় ।।
ওদিকে
হাওড়া ব্রিজের গঙ্গার রুপোলি স্রোতে
কোথায় কোথা হ'তে সমুদ্রে-মেঘে রঙিন অভিজ্ঞ বেগে

অন্বিষ্ট জলের চলন   প্রাণে ঢেউ-এর গড়ন   সাংখ্য মাত্রায়
অসংখ্য এক যাত্রায়   আমারি সংসারে ছুটছে—
চৈতন্যে দূরের সূর্য উঠছে।
কোনখানে সেতু   বাঁচার হেতু—
কে দেয় সাড়া   কবি নাক্ষত্রিক ছাড়া
দৃশ্য অদৃশ্যের বাঁকে   তারাও হারিয়ে থাকে
নইলে সইতে পারত না
তীব্র কলকাতার অগণ্য কোটির প্রার্থনা ।।

মণীশ ঘটক (১৯০১)

মনে মনে

আশ্চর্য কবিতা লিখি কখনো কখনো
মনে মনে।
কলকোলাহল তুলে খাতার পাতায়
যে কথারা কাগজ ভরায়
তারা যেন বেলা শেষে মেলা ভাঙা অচিন সবাই
জনে জনে ডাকি ও সুধাই
হ্যাগো, ছিলে না কি মনের ভেতরে সঙ্গোপনে
দুয়ার না খোলা ঘরে অনাদরে কিংবা বিস্মরণে ?

সব শব্দ বোবা হয়ে যায়
কথাদের কাকলি ফুরায়
নির্বাক কাগজ শুধু মুখ তুলে সাদা চোখে চায়
থমকে যাওয়া কলমের ঝরণা শুকায়।

যতই খুলি না কেন অক্ষরের অক্ষয় পসরা
কবিতা চায় না দিতে ধরা

বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ ঝলকায়
তারপর মুচকি হেসে মনের মেঘের রাজ্যে লুপ্ত হয়ে যায়।
গুরু গুরু দুরু দুরু মন
থেকে থেকে শুনি তার চাপা গর্জন।
অকালে নামবে নাকি ধারা বর্ষণ
চাঁপা কদমের বনে বনে
মনে মনে ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪)

বেনামী বন্দর

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড় !
মাল বয়ে-বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।
কূলহীন যত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো-পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হয়রান লবেজান তরী
বরখাস্ত্ হ'ল ভাই,
পাঁজরায় খেয়ে চিড় ;

মহাসাগরে অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
সেই— অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভিড় ।

দুনিয়ায় কড়া চৌকিদারি যে ভাই
হুঁশিয়ার সদাগরি,
হালে যার পানি মিলেনাকো আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি' !
কোমরের জোর ক'মে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধ'রে গেল কাঠে, আর যার
কল্‌জেটা গেল ফেটে,
জনমের মতো জখম হ'ল যে যুঝে ;
সওদাগরের জেটিতে-জেটিতে
খাজাঞ্চিখানা ঢুঁড়ে,
কোনো দপ্তরে ভাই.
খারিজ তাদের নাম পাবেনাকো খুঁজে !

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভিড় !—
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়ালো অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে ;
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়,
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড় !

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পথ

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদক্‌শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,
চমরীর ক্ষুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা !

বাদক্‌শানের চুনি আর খোটানের নীলার নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,
ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,
লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ—
লাদকের কস্তুরির গন্ধ যেখানে আজো আছে লেগে পুরানো স্মৃতির মতো।

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি ;—
আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল করা
দু-ধারের দীর্ঘ দেওয়ালের
শাওলাগন্ধ ছায়ায়-ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো।
ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,
ঝিলমিল দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থামা,
ধূপের গন্ধে সুরভি ; দেবায়তনের দ্বারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ।

ভয়ে-ভয়ে স্মরণ করি সে পথ ;—
ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের 'ঠৌরি' ;—
যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম পায়ে মাড়ানো।
যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ ;
অন্ধকারে শানিত চোখ চমকায়।

যে-পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতার-বাহিনীর অশ্বক্ষুর-বিক্ষত ;
করোটি-কঠিন যে-পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।

স্বপ্ন দেখি সে-পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি !

ফ্যান

নগরের পথে-পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত !
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায়-রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে ব'সে ব'সে ধোঁকে
আর ফ্যান চায়।

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান ;
তবু যেন সভ্যতার ভাঙেনাকো ধ্যান !

একদিন এরা বুঝি চষেছিল মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল ;
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,
কোনোদিন নিয়েছিলো কেউ,
জানেনাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়-টলানো ।

অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ ;
তার চেয়ে রাখি যদি ফেলে,
প'চে-প'চে আপন বিকারে
এই অন্ন হবে না কি মৃত্যুলোভাতুরা
অগ্নি-জ্বালাময় তীব্র সুরা !
রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?

তিনটি গুলি

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত
ভুলে গেল চন্দ্রসূর্য
ভুলে গেল কোথায় প্রভাত ।
তুমি কত কিছু দিলে
তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিভূতি ;

সূর্যের মতন দিলে সব পরমায়ু
বিকিরিত প্রেমে করুণায়।
আমরা দিলাম শেষে তুলি
তিনটি কঠিন ক্রূর গুলি।

প্রথম গুলির নাম
অন্ধ মূঢ় ভয়।
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয়।
বিবর-বিলাসী হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয়।

তিনটি গুলির শব্দ!
অন্তহীন তার প্রতিধ্বনি
কেঁপে-কেঁপে দিগন্ত ছাড়ায়,
মানুষের ইতিহাস পার হ'য়ে যায়।

দূর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে-চেয়ে দেখি—
পিস্তলের শব্দ আর নয়।
অগণন মানুষের বুকে বেজে-বেজে
যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রতিহত সেই শব্দ নিজেরে ভোলে যে;
হ'য়ে ওঠে পরিশুদ্ধ
মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।
মারণ-অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়।

সাগর থেকে ফেরা

নীল ! নীল !
সবুজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝি না,
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম-বেশী নীল !
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙচিল।

ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে,
সাদা ফেনা থেকে যেন
শাঁখ-মাজা ডানা মেলে
আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে।

মিথ্যেই
মিল-খোঁজা মন চায় উপমা।
নেই, নেই !
হৃদয় দু'চোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,
সেই ! সেই !

মাটি, গাছ, তীর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা,
সুবিশাল ডানা মুড়ে
নোনা ঢেউ-এ আলগে ছে ভাসা,
কূল-ছাড়া জল আর
মেঘ, তারা, হাওয়া নিয়ে থাকা,
সময়ের নীলে শুধু
উদ্দাম অবিরাম আলপনা আঁকা,
কি যেন কি যেন ঠিক
মন দিয়ে জানতে না জানতে,
ষ্টীমার পোঁছে যায়
আজ কাল-পরশুর প্রান্তে।

অজিত দত্ত (১৯০৭)

ছাগল

গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞা যেন বিচ্ছুরিত দাড়ির আভাসে,
শৃঙ্গ দেখে শঙ্কা হয় তেড়ে বুঝি ঢুঁ মারে কখন,
উদাসীন দৃষ্টি, কিন্তু তৃণশষ্পে লক্ষ্য বিলক্ষণ,
যাহা পায় তাহা খায় দ্বিধাহীন নির্বিচার গ্রাসে।
নধর মাংসল দেহ, তবু কিন্তু খুঁটি ছেঁড়ে না সে,
সঞ্চয়ের মূল্য জানে, ফল পায় চর্বিত-চর্বণ।
ধারে না রুচির ধার, নির্বিকল্প অনুদ্বিগ্ন মন,
তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক, বিশ্বরূপ দেখে কচি ঘাসে।
অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা, ডুমো ডুমো কিম্বা মিহি কিমা,
স্বাস্থ্য আর কান্তি দানে সবি ধন্য সভ্যতার হিতে।
সর্বদেশে-কালে প্রিয়, হোক পক্ক যে কোনো রীতিতে,
ধর্মে কর্মে পালে-পর্বে স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় মহিমা।
বলিবর্দ্যে কীর্তি ঘোষে নিজ চর্মে গড়া জয়ঢাক—
তবুও কী সহ্যশীল দণ্ডাহত শ্যামল পোশাক ।।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮)

সাগর-দোলা

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ?   মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে

সাগর-দোলা,
সারাদিনরাত ঢেউয়ের তোড়ে
নাগর-দোলা,
আকাশ-মাতাল জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
দিগন্ত জোড়া সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।
সারাদিনরাত হাজার ঢেউয়ের উচ্চস্বরে
অন্ধ অবোধ হাওয়ার ঝড়ে
কী যে লুটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে ?   মনে কি পড়ে ?
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে
ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে
ভাঙন এনে,
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে চাঁদ এসেছে ফিরে
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে
তোমাকে আমাকে অন্ধ অতল জোয়ারে টেনে
মনে কি পড়ে ?
কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে
কত যে দিনেরে চুম্বন টেনে দিয়েছি মুছে
কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত ঢেউয়ের দোলা,
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারাদিনরাত জানালা খোলা।

দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জ্বরে
কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে হাজার ঝড়ে
কত সমুদ্র তপ্ত জোয়ার-জ্বরে
মনে কি পড়ে ?
কত মৃত চাঁদে এনেছি ফিরায়ে রাত্রিশেষে
কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে
ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন অন্ধ অতলে গিয়েছি ভেসে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?

চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

বুদ্ধদেব বসু

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো !—কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো এক মনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত !
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি ?

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে।—এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকায় যেতে যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে।— কী দুঃসাহস ! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো, দ্যাখো
কেমন নীল এই আকাশ।—আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

বেশ্যার মৃত্যু

তারই বোন-সতিনেরা কাঁধে করে নিয়ে এলো তাকে :
মাথা হেঁট, চোখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, দুর্বল পা ফেলা,
গুটি কয় গম্ভীর বালিকা যেন, অকস্মাৎ ভুলে গেছে খেলা ;—
ঈষৎ বিব্রত হ'লো আকাশ ও লোকজন দেখে।

দিনের বিশাল রৌদ্র বদলে দিলো তাদের চেহারা ;
সব মুখ এক যেন, সব দেহ বাতাসে বিব্রত ;
অচেনা, অস্বস্তিকর, আশাতীত লজ্জায় আবৃত
পরস্পরে ভর দিয়ে কুঁকড়ে ছোটো হ'য়ে গেলো তারা ;

হারালো অস্তিত্ব এই ভিন্ন দেশে, নিঃস্ব হ'লো নারীত্ব, যৌবন,
যেহেতু কোথাও আর নেই যেন কামুক পুরুষ।
এক বোবা, নিশ্চল দুপুর শুধু ; আর যেন মদ গিলে বিলুপ্ত, বেহুঁশ,
অনাক্রমণীয় ঘুমে মগ্ন একজন।

তার সব সজলতা মুছে নেয় ক্রমশ আগুন,
ছড়িয়ে রসিক জিহ্বা গ্রাস করে স্তন, জানু, যোনি ;
যে সব গোপন রন্ধ্রে কোনো মত্ত নাগর নামেনি,
সেখানেও লালসায় খুঁটে খায় অবশিষ্ট নুন।

এদিকে শহরে সন্ধ্যা, অন্য ক-টি ঘরে ফিরে চলে,
চোখ টেপে ল্যাম্পোস্ট, গলির গন্ধ উৎসাহ বাড়ায় ;
পায়ে শক্ত মাটি পেয়ে ভগিনীরা আবার দাঁড়ায়
দগ্ধ হ'তে ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার অনলে।

এক অপরিচিতা মৃতার স্মরণে

বুঝেও বুঝিনি, তাকে নিয়ে গেলো নিঃশব্দে যখন
রৌদ্রে আর মসৃণ নিয়মে লিপ্ত উজ্জ্বল বিকেলে :
বাহকেরা, লব্ধজ্ঞান, সৌম্য, যেন আলোকলক্ষণ,
চলেছে বিনম্র, মৃদু, প্রায় যেন বাতাসে পা ফেলে।

(রাসবিহারী অ্যাভিনিউ শব্দ, যান, দোকানে দৈনিক ;
পথ ছেড়ে ব্যস্ততা দাঁড়ায় স'রে, কখনো বা তাকায় পথিক।)

এবং দু-চারজন অনুগামী মন্থর মোটরে :
কিছুটা বিস্মিত, মুগ্ধ—যেন কোনো অদম্য ডাকাত
সব দৃষ্টি, সব দৃশ্য, লুঠ ক'রে নিয়েছে হঠাৎ,
রেখে গেছে আশ্চর্য আঁধার শুধু চক্ষুর কোটরে।

(আশ্চর্য আঁধার—না কি অন্য এক আকাশের জ্যোতি ?
রঙিন খেলেনা সব ভেঙে দিয়ে, কেউ বুঝি পেঁছিলো সম্প্রতি।)

আর আমি, লেখা ছেড়ে, বারান্দায় শব্দের সন্ধানী,
তাকে দেখেছিলাম মিনিট-দুই—মানিনি, সে মৃতা ;
মৃতা নয়—যৌবনপ্রতিমা, নারী. হৃদয়প্লাবিনী,
যেন স্বপ্নে-দেখা কোনো চিরন্তনী সম্ভাব্য বনিতা।

সুন্দর, সংহত, শান্ত—নারীত্বের আদিম স্বভাবে
সন্নত সূর্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখ—উন্মুক্ত, নিষ্কল,
যেন ধীর, বিশাল গ্রীষ্মের যত্নে এইমাত্র পেকে-ওঠা ফল,

নিংড়ে নিয়ে মাটির সমর্থ মদ, ঋতুর নির্যাস,
পার হ'য়ে অবিশ্বাসী অপেক্ষার ভঙ্গুর উচ্ছ্বাস,
হ'লো সে চরম, পূর্ণ। এইবার খ'সে প'ড়ে যাবে।

গাঁয়ের মেয়েরা

আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা ;
শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পরে দিন দীর্ণ, শূন্য—
বৃষ্টি নেই !

দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
তবু তো কিছু ভালো মেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বন্ধু—
যেহেতু ফলে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে,
এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন।

বল তো, বোন, কবে আবার মধুমতী গাভীর বাঁট হবে উচ্ছল ?
ঢেঁকির গম্ভীর শব্দে দিয়ে তাল জাগবে হাতে পায়ে ভঙ্গি ?
ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে ? ডাকবে উল্লাসে দর্দুর ?
শিশিরবিন্দুর আদরে ভরপুর ঝুলবে আঙিনায় কুমড়ো ?

যেমন বেঁচে থাকে কেন্নো, কেঁচো, আর মাটিতে বুক টেনে পন্নগ,
যোজন পার হয়ে ক্লান্ত কূর্মেরা আবার ফিরে পায় সিন্ধু,
তেমনি ঋতু আর শ্রমের আশ্রয়ে চিন্তাহীন বাঁচি আমরা—
অথচ বিনা কাজে বিহান কাটে আজ, নামে না সন্ধ্যায় শান্তি।

অঙ্গরাজ ! বলো, করেছি কোন পাপ, এ কোন অভিশাপ লাগলো !
জননী বসুমতী, ভুলো না আমরাও তোমারই গর্ভের পরিণাম।
হে দেব ঐরেশ ! মহান ! মঘবান ! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও—
বৃষ্টি দাও।

বিষ্ণু দে (১৯০৯)

ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোদ্ধার

(হপকিন্‌স অবলম্বনে)

মনস্বিনী, মর্ত্যহীন, সমান, সংবাদী ; চৈত্যাচ্ছদ, বিরাট, বিতত
সন্ধ্যা তীব্র হ'তে চায় কালের বিপুল, সর্বগর্ভ, সর্বগৃহ, সর্বশবাধার নিশা ;
স্নেহার্ত পাণ্ডুর তার বিষাণ-প্রদীপ অস্তে লগ্ন, তার মত্ত অন্তঃশূন্য শুভ্র হিম-দীপ
নভোলগ্ন,
দিশাহারা অপচয়ে, তার সায়ন্তন নক্ষত্রেরা, সামন্ত নক্ষত্রবৃন্দ আমাদের শিয়রে
সন্নত অগ্নিমুখাঙ্কিত মহাকাশে। কারণ মর্ত্য যে তার সত্তাকে নিষ্ক্রান্ত করে,
তার বর্ণালি যে ক্ষান্ত হ'ল ;
গতলক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট, ঝাঁকে-ঝাঁকে, পরস্পরে পরম্পরাহীন, আত্ম-মগ্ন আত্মহন্তা
অজিহ্বিষা,
বিস্মরণে মতিছন্ন, সকলই এখন। হৃদয়, আমাকে ঘিরে ধরো, এ-বিভীষা
বাঁধো : আমাদের সন্ধ্যা শেষ ; নিশা আমাদের করে ভূত—অভিভূত করে
নিশ্চিহ্ন, নির্গত।
শুধু তুণ্ডপত্রময় তরুশাখা যেন নাগবংশী ; লোহিত বনটে কাটে, তন্তুজ-মসৃণ
নিষ্প্রাণ আলোক, কালো,
কালো আর কালো অন্তহীন। আমাদের উপকথা, হে দিব্য কথক ! দাও
আহা দাও জীবনকে, জীর্ণ,
খুলে-খুলে দিতে তার জট, একদা বিচিত্র, পঞ্জীকৃত, সংরঞ্জিত স্নায়ু-রেখ
দুটি ভাগে ঘুরণের পাকে ;
এখন সমস্ত কিছু দুটি যূথ, দুটি জাতি—কালো, শাদা ; জেনো মেনো এই মাত্র,
মন্দ, ভালো ;
মাত্র দুটি ; দুটি মাল আবিশ্ব আড়তে, যেখানে কেবলমাত্র এই দুটি এ-ওর
চাহিদা হাঁকে ;
একই কলে, যেখানে স্ববদ্ধ, স্বব্যাবৃত, নিষ্কাশিত, নিরাশ্রয়, চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তা
আর্তনাদে নিষ্পেষিত, চূর্ণ দীর্ণ ॥

ভাদ্র সন্ধ্যা

ভাদ্রের শেষের সন্ধ্যা, আশ্বিনের আসন্ন বন্দরে।
দেখি, ভাবি নির্নিমেষ।
হে পৃথিবী!

হে স্বদেশ! তোমাদের কিছুতে যায় না ভোলা।

রূপেগুণে ভোর প্রাণ, মানবিক চোখ কান স্পন্দিত হৃদয়
ঢেউ তোলে অভিরাম, নন্দিত চৈতন্যে দোলে,
অবিশ্রাম ভাঙে পাড়, অভ্যাসে অপরাজিত,
যেন জীবনের সৌন্দর্য অমর। এবং মানুষ অলৌকিক
সৌন্দর্য যাদের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব আপ্লুত
আকস্মিক অশ্রুস্নানে হাস্য স্মিত,

যেন সুভদ্রার তরঙ্গিত শরীরের নারীত্বের বিভা,
মুখের নিটোল, কটির ভাঙন, বক্ষের পাহাড়,
বাহুর নক্ষত্রবৃত্ত, চিরস্থায়ী পরিবর্তনের খোদাই আকাশে বদ্ধনীবি।
অথচ আমরা চিরপরিবর্তনীয়—এখন এখানে দ্রুত,
মুহূর্তেই ওখানে নিঃঝুম।

ভাদ্রের আলোর স্নান, শরত আকাশে শরীরে উজাড়।
মেঘ, ঢেউ, বালিয়াড়ি, উপলমুখর সূর্যের প্রতিভা,
আলোর তরঙ্গে দোলা।

তারপরে? ঘর, অনিদ্রা বা অন্ধকার নীলাকাশে আসমুদ্র ঘুম॥

অকাল মেঘে সূর্যাস্ত

যদিচ শীতের সূর্য, তবু অকালের মেঘের বাহারে
অস্তগীতিনাট্যে নামে চূড়ান্ত সুন্দর ;
কিংবা যেন প্রাজ্ঞ কোনো নৃত্যগুরু ভারতীয় নায়িকার মাথুরে শৃঙ্গারে
স্থিতধী গম্ভীর সমে ম্লান দিগম্বর ভরে
আলারিপ্পু শেষ করে অনন্তবর্ণমে ।
অথবা হয়তো কোনো চিরচিত্রাঙ্গদা, পৌরুষে রূপসী
কিন্তু সপ্তবর্ণে মহানৃত্যপটীয়সী,
বয়স বা অভ্যস্ততা যার ভঙ্গে নিত্য নতশির ।

কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে ছাদে ছাদে,
আকস্মিক দু'চারটি শান্ত স্তব্ধ গাছে,
গোধূলির শহুরে বিষাদে অথচ একটি
দীপ্ত বিজয়ের অভ্রংলিহ তীব্রতায়
ক্ষিপ্র বর্ণগঙ্গা ছায় সাবিত্রী ক্রন্দসী ।

এবং, স্মৃতিও ছায় উন্মোচিত বিস্মৃত আকাশে
শহরে, শহর ছেড়ে অন্তহীন উদার নিসর্গে,
সমুদ্রে বা পাহাড়ে প্রান্তরে ।
সমস্ত স্মৃতির এক ব্যাপ্ত প্রতিভাসে,
উদাত্ত করুণ ভর্গে অন্তরঙ্গ, তীক্ষ্ণ, স্তব্ধ, স্বর্গ-নরকের চেয়ে
অনেক উজ্জ্বল, সূর্যাস্তের মতোই-আপন, ঘনিষ্ঠ ও বরেণ্য,
অসামান্য সাধারণ্যে আমাদের মৃত্যুহীন
জননীরই মতো গরীয়সী ।।

চার দশকের পুরোনো ছবি

তখনও কি বারান্দায়
রোদ্দুরের আলপনা ? নাকি শুভ্র ছায়ায় অধ্যাস ?

চার দশকের পুরোনো ছবি

হালকা কুরশিতে তাঁর অক্লান্ত আসন,
লিখে যান অপরিসর টেবিলে,
খোয়াই-এর প্রখর হাওয়ায়—

কি লেখেন ? উপন্যাস ?
অন্য এক গোরার বিকাশ ? কিংবা কোনও দামিনীর আরেক বিন্যাস ?
কোনও অন্যায় বা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার বিষয়ে
প্রতিবাদী ব্যাখ্যার প্রবন্ধ ? বা ভাষণ ?
নাকি কোনও দীর্ঘায়ু কবিতা ? ছন্দে মিলে
নিরবচ্ছিন্ন বুননে মনে মনে কালের রাখাল বাঁশরির লয়ে লয়ে ?

দাঁড়ান। খোদাই মূর্তি। কলমের সে প্রচণ্ড গতি অবসান।
পদক্ষেপ করবার, অন্য মনে, দুই কোণে মিত বারান্দায়।
দূরদেশী চোখের তন্ময়-অন্বেষায়
মনে হয় অবচেতনের মুখে ফুটে আসে সুর, কথা।
গান আসে, গান ওঠে, শব্দ সুর
নামে পড়ন্ত হাওয়ায়।

তারপরে আবার হঠাৎ টেবিলে বিজয়ী হাত
রাখেন, এবং ঐ কলমের দাক্ষিণে হাওয়ায় সর্বত্র, সর্বথা,
ওড়ে কথা, ওড়ে সুর।
অন্ধ করেই না বন্ধ তার পাখা
বারান্দায় সূর্যগুলি নেমে বসে নতজানু,
ছায়াগুলি করে প্রণিপাত,
ভূলুণ্ঠিত নিথর হাওয়ায়।

ছবি দেখা ক্ষান্তি পায়।
গাছের ছায়ায় স্থাণু
যুবকটি—বা বালকই—নিবিড় চৈতন্য ধরে ফিরে যায়
আসন্ন সন্ধ্যায়,

টাটাহোসে চাখানায়, নাকি রিক্ত বোলপুর স্টেশনের নিঃসঙ্গ চত্বরে ।।

রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে

তুঙ্গ হিম হ্রদেই তো চিরকাল নদীর শৈশব।
পূর্ণ রূপ পায় শ্যাম অন্ত্যজের বদ্বীপে গঙ্গায়,
পাণ্ডবে না কৌরবে না, সূর্যবংশে যাদের গৌরব।

মানসহ্রদের নীল আমাদের রক্তাক্ত সংজ্ঞায়—
দুর্গতির অন্ত নেই, তবু নীল অনন্ত সাগর,
তবু ভাগীরথী বয় বীর পায়ে জানুতে জঙ্ঘায়,

ক্লান্তিহীন শঙ্খরবে দিনরাত্রি সমানে জাগর
কপিলগুহায় যাত্রী সহস্র সহস্র মুখ খুঁজে,
সুন্দরীবনের বাঘ ভাসে, ডোবে কুমীর হাঙর।

আজও চাই সকলেই, কেউ জেনে কেউ বা না বুঝে,
নামাই মানসগঙ্গা রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে,
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে সমতলে তোরণে গম্বুজে,

চাই অম্বুজা দীঘিতে মুক্ত রবিরশ্মি যেন মেশে,
জনপদে, জীবনে ও জীবিকায় চাই সে বৈভব
যা শুধু সম্ভব যদি মৃত্যু আসে স্বয়ম্বরে হেসে,

যদি আশি বছরের সঙ্গে থাকে বৈশাখী শৈশব।।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯)

বউ

কোথাও এমন বিন্দু নেই
যেখানে থেমেছে এসে প্রাণের কলঙ্কী ইতিহাস।
সমুদ্রের গান শোনে সাইক্লোনে ঘাস।
কোথাও পাপের ক্ষয় রাখে নি তেমন কিছু পরিচ্ছন্ন খেই
পাবকের মতো, যার নীল বাহুপাশ
পাবো নদ নদী-হ্রদ-সমুদ্র-সিনানে।
তবু অস্নাতক দিনে খুঁজে নিতে হয় যদি না থাকার মানে
তোমাকে দেব না আমি যেতে
কোনো বিবাহিত-রাত্রি ঝলসানো আগুনের ক্ষেতে
পাছে আলোকিত ক্ষণে ক্ষতমুখ পাও
যা তুমি, অথবা হ'তে পারে মায়া সবুজকন্যাও
যা তুমি অনেক জন্মে ছিলে
আমি উনপঞ্চাশের ফলতরু, পত্রডাল নীলে॥

অরুণ মিত্র (১৯০৯)

এ জ্বালা কখন জুড়োবে

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা ভাসা কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায় সে আশঙ্কাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যতকে আদর করবার সংসার।

গড়বার, আদর করবার, ফুলে ফলে কাকলিতে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে গেল তা এই ক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে। কতদিন তুষার-শীতল স্রোতের প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উত্তুরে হাওয়ায় সন্ধ্যাঝরা বর্ষণ। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বর্ষার বিষ উত্তাল করল তার তিন সমুদ্র, এপার ওপার জুড়ল তার কান্নার কল্লোল। দাওয়ায় বসে আর ছায়াপথে স্বপ্ন পাঠানো যায় না, হারানো তারাগুলো শুধু কাঁটা হয়ে ওঠে আগাছার ঝোপে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
পুরনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায় যন্ত্রণার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে-ওঠা ফুঁপিয়ে ওঠা আবেগ শরীরের সমস্ত তন্তুতে থরথর করে। সেখানে শান্তি ঝরে না, সান্ত্বনা ঝরে না। ছেলে ভুলোনো আসরে কাঠ-পুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গি শক্ত হয়ে থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ জয়ের উল্লাস! তার তাড়নায় আঁকাবাঁকা সুতোলী নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ বুকের তুষানলের আভায় কালো দিগন্তে পাড় বোনা, দুর্গের গড়ে সঙিনের চকমকির ফুলকি আর রাজবাগিচায় জঙ্গলের চাউনি। আরো বলি চাই। অনেক তো দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেল আচমকা চোপে। আর কত! কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে ?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

কখন ?

রাস্তায়

হাওয়াঘরের উপরে মোরগটা ঘুরছেই। আমি এক মরা আকাশ নিয়ে শহরের রাস্তায়। আমার সামনে ঐ হাওয়াঘর। আর এপাশে ওপাশে দেয়ালের ফাটলে বটের চারা হাওয়ায় শিরশির। ভিত পর্যন্ত শিকড় নামতে নামতে অন্ধকার কতখানি গভীর হবে কে জানে। ততক্ষণ সেকেলে গাছগুলো পাহারাঅলার মতো খাড়া। তাদের শরীর আমার ভাবভালবাসাকে আমল দেবে না। অথচ নীল চাঁদোয়া থেকে একরাশ ফুলের ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো হয়েছে। ঠুনকো সব পাপড়ির ভিতর দিয়ে হাওয়া।

আলতো হাওয়া ছাইগাদায়। ছাই আমার আস্তানার আনাচে-কানাচে রাস্তাঘাটে। হাঁটো ঘোরো দৌড়ও, মাটিতে কোনো রঙ ছলকায় না। না জলের না আলোর না ঘাসপাতার। আর আজন্মের লোহাপাথর, তারা যেন ধূসর ঘুমে ছাওয়া। কোনো সময় হঠাৎ রক্তের জ্বালায় আমি তাদের টের পাই। বাইরে সব চুপচাপ। এমনকি আমার বুকের টালমাটাল দুই ঠোঁট চেপে নিঃশব্দ হাওয়ায়।

তবু ইতিমধ্যে পাঁচিলের গা থেকে ছবিগুলো খসতে শুরু করেছে। টুকরো টুকরো হাসিমুখ শহরের খাদের উপর ভাসছে। হাওয়ায়।

অস্থিমজ্জায় কোনো

অস্থিমজ্জায় বুঝি কোনো গোপনতা থাকে।
তাদের ঠোঁট চোখের তারা আর ত্বকের আলোয়
আমি উদ্ভাসিত হয়েছিলাম,
তারা গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখেছিল
আমি তাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম,
কেউ কিছু সাজিয়ে সাজিয়ে বলে নি
সবটাই পাপড়ি খোলার সঙ্গে

পাতার উপর রোদ পড়ার সঙ্গে
মৌসুমী হাওয়ায় বৃষ্টির সঙ্গে
এবং শিশুরা বড়ো হয়ে যখন হঠাৎ তাকাল
আর তাদের বাপ মা মনের বোঝা যখন পালকের
মতো উড়িয়ে দিল
তার সঙ্গে,
কেউ কিছু সাজিয়ে বলে নি,
কিন্তু প্রত্যেকটা কথা নিশানের মতো দুলছিল
আমাকে ডেকে ডেকে, আমি শুনেছিলাম
এবং এক বঙ্কু নদী আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল
তাদের বুকের দরোজায়।
আরও কথা চোখ মুখ থেকে
আরও কথা হাত পা ঘুরোলে
সবই আকাশের তারা হবার মতো.
আমি মাথা তুলে ধরেছিলাম
উজ্জ্বলতার জন্যে
এবং রাত্তিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম।
আশ্চর্য এই : আমি এখন নৈঃশব্দ্যে
কোনো গুঞ্জন আর নাই
বাতাসেও না জলেও না,
আমাকে ঘিরে এত ছলছল
যেন দু' চোখের পাতার নিচে জড়ো হয়েছে।

তবে কি কোনো বলা ধমনীর ভিতরে নয় ?
নিশানের যত রঙ বাতিবে ধুয়ে যায়
এবং কোন্ উৎসে গান আছে তার জন্যে আমি মাথা কুটি
চোখ মুখ ঠোঁটের ভাষার তলায়
বুঝি এক করাত শিকড়ে শিকড়ে বসানো ছিল।
অস্থিতে মজ্জায় ভয়ঙ্কর গোপনতা ছিল।

অশোকবিজয় রাহা (১৯১০)

প্রান্তিক

প্রান্তিক, তুমি নূতন কালের প্রান্তে দাঁড়ালে এসে
পূবের আকাশে নূতন সূর্যোদয়,
যত ছায়াভয় আনাগোনা করে কালো রাত্রির তলে
মিলায়েছে তারা সুদূর দিগন্তরে।

তবু জানি মনে পৃথিবী এখনো রয়েছে ঢাকা
পলাতক রাত আড়ালে ফেরে--
আদিম বনের বিশাল ছায়ায়, গুহার অন্ধকারে
সাপের মতন এখনো জড়ায়ে আছে।

অন্ধ মনের অতল গহনে জমাট রাত্রি কালো
সুড়ঙ্গপথ ছড়ায়েছে শত শত—
সে জটিল পথে হিংসার ছায়া কত করে আনাগোনা
প্রখর নখর, শানিত চোখের আলো।

প্রান্তিক, আজ নূতন সূর্যোদয়
রাত্রিশেষের বিজয় ঘোষণা করো
প্রার্থনা করো প্রাণসূর্যের কাছে।
মানুষ যেখানে হারালো নিজেকে অতল অন্ধকারে
ছায়া-বিভীষিকা ঘিরে আসে চারিধারে
সেখানে পাঠাও আলোকের বরাভয়।

নূতন দিনের উজ্জীবনের মন্ত্র শোনাও কানে
বলো, পৃথিবীর যত নরনারী সূর্যের সন্ততি।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০)

জুতো পালিশ

বেওয়ারিশ যত কিশোর ছেলেরা অর্ধনগ্ন দেহে
পথিকের পদধূলায় মলিন তাকায় না কেউ স্নেহে
জুতা ঝেড়ে মুছে পালিশ লাগায় দুর্বল কচিহাতে
মুখে তবু এক অদ্ভুত হাসি অসীম অজ্ঞতাতে
মহানাগরিক পাদুকাপিষ্ট দুর্ভাগা শিশুদল
পালিশের প্রতিযোগিতায় করে কী করুণ কোলাহল !

এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে ।
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে ।
হে কাল হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস !

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা ।

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি

এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে—
চৈতালি সূর্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা।

একফালি আকাশের কোল-ঘেঁষা কার্ণিশ
রং চটা গম্বুজ দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়
সৃষ্টির এক ঝাঁক পায়রা।

রূপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর
হে কপোত, পারাবত পায়রা
যে দিকে দুচোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রূপালি পাখায় আঁকা শূন্য।
আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

দিনেশ দাস (১৯১৩)

কাস্তে

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু !

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে !

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে ।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু !
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু !

ভারতবর্ষ

চোখভরা জল আর বুকভরা অভিমান নিয়ে
কোলের ছেলের মত তোমার কোলেই
ঘুরেফিরে আসি বারবার,
হে ভারত, জননী আমার !

তোমার উৎসুক ডালে
কখন ফুটেছি কচিপাতার আড়ালে,
আমার কস্তুরী-রেণু উড়ে গেছে কত পথে
দিগন্তে আকাশে ছায়াপথে,
তবুও আমার ছায়া পড়েছে তোমার বুকে কত শত ছলে
তুমি বাঁকা ঝিরঝিরে নদী ছলছলে
বাজাও স্নেহের ঝুমঝুমি,
জননী জন্মভূমি তুমি !

তোমার আকাশে আমি প্রথম ভোরের
পেয়েছি আলোর সাড়া,
দপদপে হীরে-শুকতারা
অস্ফুট কাকলি,
জলে ফোটে হীরকের কলি
মধ্যাহ্নে হীরের রোদ—
হে ভারত, হীরক-ভারত !

কোন্ এক ঢেউছোঁয়া দিনে
বঙ্গোপসাগর থেকে পথ চিনে চিনে
কখন এসেছি আমি ঝিনুকের মত,
তোমার ঘাসের হৃদে ঝিলের সবুজে
খেলা করি একা অবিরত !

আমি তো রেখেছি মুখ
তোমার গঙ্গোত্রী-স্তনে অধীর উন্মুখ,
মিটাল আগ্নেয় ক্ষুধা তোমার অক্ষয়বটফলে
দিনান্তে সুডৌল জানু মালাবার করোমণ্ডলে
দিয়েছ আমাকে কোল :
কত জলতরঙ্গের রাত্রি উতরোল
ভ'রে দিলে ঘুমের কাজলে :
মিশে গেছি শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে
তোমার মাটির নাড়ি হাওয়া আর জলে
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত শরৎ—
হে ভারত, হীরক-ভারত !

আজ গৌরীশঙ্করের শিখরে শিখরে
জমে কালো মেঘ
বৈশাখী পাখির ডানা ছড়ায় উদ্বেগ :
তবু এই আকাশসমুদ্র থেকে কাল
লাফ দেবে একমুঠো হীরের সকাল
চকচকে মাছের মতন—
হে ভারত, হীরক-ভারত পুরাতন !

নোটবুক : ১৯৮৩

দেশের মাপকাঠি কি ছুরি কাঁটায় !
এসিয়াড়ের টেব্‌ল-টেনিস খেলোয়াড়েরা বলে গেলেন
"হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, মোরগমশল্লম, কইলে কাবাব,
আর রঙিন ছায়াছবিতে ভারত পৃথিবীর ভুস্বর্গ ।"

এদিকে অগুন্তি ভেড়া, শুয়োর, খাসী, বড়খাসীর আর্তনাদে
বিনোবাজি অনশনে অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেলেন,
তাঁর বিদেহী কণ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল
ভারী 'ভারতরত্নে'র হার, কতকটা সান্ত্বনা-পুরস্কারের মত।

এখন কে বলবে,
এই সমারোহের দেশে অর্ধেক লোক অর্ধাহারে, অনাহারে থাকে ?
ক্ষুধার ফিতে দিয়ে এ মাটিকে কেউ মাপবে না ?
এসিয়াড রঙ্গমঞ্চের আড়ালে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে
কত রামকিশোর, কত রামপ্রতাপ, কত মীনাবাইয়ের দেহ
চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল বড় বড় লোহার বীম পড়ে
শুধু দু'মুঠো গোপন গম সংগ্রহের জন্যে :
মীনাবাই তার সারা শরীরের শ্রমকে পরিণত করেছিল
দুটি নিটোল মাতৃস্তনে :
আহা ! তার সাতমাসের বাচ্চাটি কি
একটু দুধের জন্যে এখনো কাঁদছে !

এখানে সরকারী দপ্তরের শূন্য চেয়ার টেবিলের আশেপাশে
উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষগুলো ঘুরে বেড়ায়
যাদের মুখ আছে, কিন্তু জিভ নেই :
তখন শোনা যায় কর্তামশায়ের নম্র কণ্ঠস্বর,
"কাকে বলব ? চেয়ারকে ?"
এত ভাল হলে কি সরকারী সংসার চলে !

জানি, আমাদের ভবিষ্যৎ ঝুলছে শূন্যে—মহাশূন্যে,
তবু মনুমেন্টের শুঁড়ের ওপর লাল রং লাগিয়ে কি লাভ ?
আকাশে একটু নীল, একটু মেঘ, একটু জলের রং থাকলে ক্ষতি কী ?
বরং বন্ধু মুলুকরাজের কথামত
শহরের হৃৎপিণ্ড সাফাই করলে বাতাস নিরাময় হ'ত,

মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিনের মর্মরমূর্তির গায়ে লাগত
একটু স্বচ্ছ বাতাস,
আমরাও ফুসফুসে ফুরফুরে অক্সিজেন টেনে
কিছুদিন মাছের মত সাঁতার কাটতে পারতুম
ময়দানের সবুজ সরোবরে।

আমরা যেন হঠাৎ ভাল হয়ে গেছি :
একদা দশ টাকা কিলো মাছের দর উঠলে
ক'লকাতার বাজারে চলত দমদম দাওয়াই,
এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়লে
একশো ট্রাম জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যেত।
তারপর সময়ের ডাল থেকে ঝরেছে অনেক শুকনো পাতা,
ঝরাপাতার কবরে সব কিছু চাপা প'ড়ে গেছে।
এখন আমরা তিরিশ টাকা কিলোর মাছ কিনছি হাসিমুখে,
ট্রামবাসের ভাড়া তিরিশ পয়সায় লাফ দিলেও
আমরা আর লাফিয়ে উঠি না :

হঠাৎ আমরা এত ভাল হয়ে গেলাম কী করে ?
কতদিন আমরা নিজেদের ঠকাব !
তবে কি বাতাসে কোথাও ভয় উড়ছে ?

কিসের ভয় ? কেন ভয় ?
এ ভয় কি আমাদের নিরাপত্তা হারানোর আশঙ্কা,
আমাদের সুখশান্তি, গাড়িবাড়ি, টি ভি-টেলিফোন
ব্যাঙ্ক, শেয়ার-মার্কেট ধ্বংসে যাবার দুঃস্বপ্ন ?
এর চেয়ে আরও ভয়ংকর ভয়—
আপনজনেরা আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলবে,
আমাদের সামাজিক অস্তিত্ব হবে বিপন্ন।
তাই মনে হয়, আকাশে বাতাসে চারপাশে কোথাও ভয় উড়ছে
এই সব অকারণ ভয়ের নাড়ীভূঁড়ি ছিঁড়ে
কবে ভোরের আলোয় আমাদের জন্মান্তর হবে !

সমর সেন (১৯১৬)

মহুয়ার দেশ

১

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।
অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

২

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

মদনভস্মের প্রার্থনা

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো ;
রাত্রে নিবিড় প্রেম : কুসুমের কারাগার।
কত দিন, কত মন্বর, দীর্ঘ দিন,
কত গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

নাগরিক

মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি

আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে ;
পাটের কলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে গেরুয়া পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এল নদীর উপরে,
চারদিকে অন্ধকার—রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোনো দ্বীপ থেকে,
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধোঁয়াটে-সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

যতদূর চাই ইঁটের-অরণ্য,
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী !
রুদ্ধশ্বাস রাত্রি শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন

আর কত লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী !

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে-
স্কুল আর কলেজ হল শেষ ক্লাইভ স্ট্রিট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামল :
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

সন্ধ্যার সময়,
রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি
চারদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ ।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮)

দেড়শো বছর বাদে
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিবেদিত)

দেড়শো বছর বাদে তোমার ছবির সামনে
নতজানু হবো
এমন যোগ্যতা নেই ।
তুমি নত হতে শেখাওনি.

সবল স্পর্ধায় মাথা উঁচু ক'রে
অন্যায়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে
বুক টান করে হাঁটতে শিখিয়েছিলে।

মানুষ গাছ থেকে বনস্পতি হয়ে ওঠে
যদি থাকে মনুষ্যত্ব ;
নালা থেকে ক্রমশ নদী হতে পারে
যদি রক্তের ভিতরে
জেগে উঠে করুণানির্ঝর।
তুমি বাংলাদেশ গড়বার জন্যে
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে
বর্ণপরিচয়ের মোমবাতিগুলো
জ্বালিয়ে দিয়েছিলে :
অথচ দেড়শো বছর বাদে আমরা
ভীষণ এক ভাঙা বাংলায় বাস করছি,
গঙ্গার এপার থেকে মেঘনার ওপার
চোখের অস্পষ্টতার জন্যে
এখন আর দেখা যায় না।
দেড়শো বছর বাদে তোমার ছবির সামনে
নতজানু হবো
এমন যোগ্যতা নেই ;
চতুর্দিকে সুবিধাবাদী বেঁটে বামনের দল
তোমার পাহাড়প্রতিম মূর্তির পাশে
পিঁপড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমরা এখন
বুকভাঙা রক্তমাখা এক দুঃখী বাংলার
ঝড়ের নৌকায় বাস করছি।

মণীন্দ্র রায় (১৯১৯)

নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়

যা ভাবো তা নয়। নদী
ঢেউ ঝিলিমিলি নয় ; স্রোত
দাঁতে কাটা, ধ্বসে পড়া মাটি, মূল ; স্মৃতি
বেঁকে যাওয়া, মোড় নেওয়া
জলধারা, ভেঙে ভেঙে চলা...

কিম্বা আরো হিংস্র। রাত্রি
নিরস্ত্র জঙ্গলে ; একা
গাছের শাখায়, বাঘ
নিচে ; দুটি চোখ
বৈদূর্যের জ্বালা ; অন্ধকারে
স্নায়ুযুদ্ধ ; মিনিট...মিনিট...

তারই কাছাকাছি। প্রেম
তুলনামূলক নড়াচড়া : কাল
রক্তে জিহ্বা দিতে চায় ; আমি
মিনিটের পরে অন্য মিনিটে শতাব্দী-লাফ দিয়ে
শূন্যে বাজি ধরি।

নাম

নাম বড় মোহময় ; তবু
নাগরদোলার টানে
বাজারের এই ওঠানামা

সতত চঞ্চল করে ; সদাই বিহ্বল
নিজের অতীত ব'য়ে ; কে জানে কখন
ফায়ারিং স্কোয়াডের মতো ভবিষ্যৎ
দু' চোখে রুমাল বেঁধে
ছুঁড়ে দেয় দ্রুত বিস্ফোরণ !

নাম বড় ভয়ঙ্কর ; ওই
লেলিহ আগুনে আমি
অশ্রু আয়ু ছুঁড়েছি অনেক ; দিনে দিনে
বেড়েছে দহন শুধু, জ্বালার বলয় ।
আগ্রাসী ক্ষুধায় তার লুফে নেয় যেহেতু সকলি
আমাকে গ্রাসের আগে
সে ডাকিনী বেঁধে আমি তাই
ঘরের বাতির মতো বিনীত আলোর
রেখে যেতে চাই—ভালোবাসা ।।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০)

অতঃপর

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, ইতস্তত ভূসম্পত্তি আছে নিম্নস্বাক্ষরকারীর। এ-দুর্দৈবে জমিদারী রক্ষা দায়। বংশপরম্পরাগত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভুবনে ঈশ্বর চালান, চলি।

পেয়াদারা বশম্বদ : প্রবঞ্চক আদায়ের প্রত্যেক ফিকির তাদের কণ্ঠস্থ আজো। অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয় নি গত দুই তিন সনে। আদালতে ফল অল্প।

যৎসামান্য আয় আজো বন্ধকীতে। ভিক্ষাপাত্র নির্ঘাৎ নতুবা। বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম—পৈতৃক বলাও চলে।

বিপদ একাকী নয়কো!—সচ্চরিত্র, কিন্তু ক'টি বুদ্ধিহীন যুবা নিরক্ষর চাষাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ করে। দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত-পা সব হিম। (সাম্যবাদী দল এরা?)

এতৎসত্ত্বেও হয়ত গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে অদৃষ্টের চাকা। ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষেফুল? আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার? চমৎকার কিবা! ধনীদের তো পোয়া বারো।

বিশেষত, ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধী। গৌরীসেনী টাকা ভবিষ্যৎ ভাবে ধ্রুব। মহাশয়,—জমিদারী যায় যাক! বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে।

এ বিষয়ে পত্রপাঠ যুক্তি চাই।

ইতি। বঙ্গচন্দ্র পাল। ঢাকা।।

ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে ।।

যেতে যেতে

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
পরনে
উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাগরা।

সে নদীর দুদিকে দুটো মুখ।

এক মুখে সে আমাকে আসছি বলে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

আর
যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল
আমি অমনি করে আসি
অমনি করে যাই।

বুঝিয়ে দিল
আমি থেকেও নেই,
না থেকেও আছি।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়
তারপর কানের কাছে
ফিসফিস করে বলল—

দেখলে !
কাণ্ডটা দেখলে !
আমি কিন্তু কক্ষনো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না ।

তার কথা শুনে
হাতের মুঠোটা খুললাম ।
কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো
সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ।...

২

গল্পটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই বলে
বুড়োধারীদের একেবারেই
ভাল লাগল না ।
আর তাছাড়া
গল্পটা বানানো ।

পাছে তারা উঠে যায়
তাই তাড়াতাড়ি
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম :
'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে...
দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর ।
সেখানে খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি ;
আর সিঁড়িগুলো সব
যেন স্বর্গে উঠে গেছে ।

তারই একটাতে
দেখি চুল এলো করে বসে আছে
এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ।'...

লোকগুলোর চোখ চকচক করে উঠল।

তাদের চোখে চোখ রেখে
আমি বলতে লাগলাম—

'তারপর সেই রাজকন্যা
আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো।
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম :

'তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।'

শুনে সে বলল :
'এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হাঁ করে বসে আছি।'
বুড়োধাড়ীরা আগ্রহে উঠে ব'সে
জিগ্যেস করল : 'তারপর ?'

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে
তার জন্যে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম --

'তারপর ? কী বলব—
সেই রাক্ষুসীই আমাকে খেলো।।'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০)

তিন পাহাড়ের স্বপ্ন

সাঁওতাল মেয়েদের গান ।

পাহাড়িয়া মধুপুর, মেঠো ধূলিপথ
দিনশেষে বৈকালী মিষ্টি শপথ ;
'মোহনিয়া বন্ধু রে ! আমি বালিকা
তোরই লাগি গান গাই, গাঁথি মালিকা ।'

'আজো সন্ধ্যার শেষে খালি বিছানা ;
আমি শোবো, পাশে মোর কেউ শোবে না—
তুই ছাড়া এই দেহ কেউ ছোঁবে না ।'...

সুরে সুরে হাওয়া তার মিষ্টি বুলায় ;
সাঁওতাল মেয়ে-কটি দৃষ্টি ভুলায়

দিন শেষ—ধূধূ মাঠ—ধূধূ মেঠো পথ
সাঁওতাল মেয়ে-কটি ছড়ালো শপথ !
হাওয়ায় হাওয়ার মতো তাদের শপথ !

২

[ধীরে মাদল]
আয় মিতেনী, আজ রাতে
চাঁদকুড়ানো মাঝ রাতে
আবছা আলোর কান্নাতে
মুখ রেখে তুই ঝর্ণাধারে আয় !
আয় জোয়ানের মন-জ্বালা
নাচ দিয়ে সই, গাঁথ মালা—
চুমুর গেলাস মদ ঢালা
দে ছুঁড়ে দে, তিন পাহাড়ের গায় ।

[জোরে মাদল]

আহা মাদল, মাতাল মাদল বাজছে তোরি জন্যে লো !
খুশির হাওয়া, পাগলা হাওয়া গান দিলো রাজকন্যে লো !
আয়, কাছে আয়, মন দে লো !

৩

চোখ কেন তোর কাঁপছে মেয়ে
বুক কেন তোর দুলছে ?
গাল দুখানি লালচে, শরীর
সাপের মতোই ফুলছে ?
কাকে মারবি ছোবল লো ?
কোন্ ছেলে তোর কী করলো !
মাদল ভেবে কেউ কি তোকে
আজকে বাজালো ?
ফুল দিয়ে নয়, ফাগ ছড়িয়ে
বিকেল সাজালো ?
কেমন দিবি সাজা রে ?
আর যাবি না পাহাড়ে !

৪

এত গান আকাশে
এত গান বাতাসে !

সাঁওতাল মেয়েটির টিপ কপালে
ছেলেটি পেছন তবু নিলো কী-ব'লে ?
রাঙা ফুল মেয়েটির খোঁপায় জ্বলে
ছেলেটি বাজালো বাঁশি তবু কী-ব'লে ?

এত মদ আকাশে
এত মদ বাতাসে !

নেশা যেন ধ'রে যায় ছেলেটির বাঁশিতে
মনে হয় দোষ নেই ভালোবাসা-বাসিতে,
তবে চাঁদ স'রে যাও, যাও তা হলে...
'ও ছেলে, পেছন তুই নিলি কী ব'লে ?'

'পথ ভুলে গেছি মেয়ে খিল্‌খিল্‌ হাসিতে ;
শোন্‌, কোন দোষ নেই ভালোবাসা-বাসিতে।'

এত আলো আকাশে
এত আলো বাতাসে !

মাইকেলের সমাধি

জল থেকে, মাটি থেকে পাথরের অন্ধকার থেকে
বিষফুল ছিঁড়ে আনব ;
পুরুষ নামের যত ফুল ফোটে রুক্ষ ও কঠিন
তোমার ঘুমের ঘরে প্রণামের মত রাখব।

লাবণ্যের মতো নাম যে-সব ফুলের
রমণীর মতো নাম যে-সব ফুলের
করুণার মতো নাম যে-সব ফুলের
সে-সব শান্তির ফুল হাতে ক'রে
সারকুলার রোড দিয়ে পথ হাঁটতে আমার হৃদয়
সাড়া দেয় না।

কাঁটা, সাপ, নরকের বমন মাড়িয়ে
তীব্রজ্বালা যদি কোন ধুতুরা, অর্কিড
একদিন বুকে ক'রে আনতে পারি ;
পাষাণপুরীতে আমি তোমাকে প্রণাম করতে যাব !

যেন কেউ মন্ত্রী হয়ে

যেন কেউ মন্ত্রী হ'য়ে এইসব মানুষের প্রেম, মানবতা
কিনে নেয়, যেন দুর্ভিক্ষের বাংলা মন্ত্রীদের সোনার থালায়
পায়েস খাওয়াবে ব'লে এই সব খবরের কাগজের বার্তাবহদের
জলশাঘরে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এরা ভুলে যায়
দু'দিন আগেও অন্য প্রভুদের বাহবায় কীভাবে কেটেছে ভোর থেকে সন্ধ্যা।
ভুলে যায় বিশ বছর জন্মভূমির দিকে পিঠ রেখে অন্ধকার রাত্রির আড়ালে
গুপ্তচর, খুনী, গুণ্ডাদের সঙ্গে খানাপিনা, যখন তখন ককটেল পার্টি;
অতি-ভোজনের শেষে কীভাবে সামলাতে হ'তো ছিঁড়ে যাওয়া প্যাণ্টের বোতাম!

এরা খবরের কাগজের সাংবাদিক :
ভুলে যায়, নিরন্নের বাংলাদেশ মন্ত্রীর মুখের শোভা নয়, অন্ন চায়...
ভুলে যায়, বাংলার মানুষ আজ আগুনের পথ হাঁটছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০)

মরা তারা

একটা তারা ফুটল এই মাত্র, একটা তারাই ;
কড়ে আঙুলে টিপ পরাল, ছোট্ট টিপ।
ছোট্ট আর ঠাণ্ডা, এই কপালে, দিয়ে গেল।
কপাল আমার!
ঠাণ্ডা কেন, তখন থেকে ভাবছি আরে,
ত্রিসানথিমাম্ ফুল্লমুখী চাঁদটাই বা
ঝরল কোথায়। ইতিমধ্যে অন্য তারায় সারা আকাশ

সা-রা-রা-রা, তবু ভাবছি ওই তারাটার ছোঁয়া এত
ঠাণ্ডা কেন।
মরে নি তো ওই তারাটা? মরে থাকলেও কত বছর আগে?
কাগজগুলোয় সেই খবর কি ছেপেছিল?
নামজাদা নয় বলেই নাকি? টিপ-কপালে তাই কাঁপছি।
মহাকাশেও ইতস্তত মাৎস্য-ন্যায়ের খুনোখুনি, একতারাটার সুরটুকু তাই
শীতল এত?
খুন হয়েছে কোনকালে, আর অ্যাদ্দিনে তার পাত্তা হল?
ঠিক তক্ষুনি "চিঠ্‌ঠি" হেঁকে ডাকপিওনটা
জবাব দিল। হাত বাড়িয়ে আবার কাঁপছি।
ঠিকানা ঠিকই, হাতের লেখাটা কার-কার-কার
মিতার নয়তো?
মিতাও যদি···খুলতে গিয়ে থমকে যাচ্ছি।
আজকাল কিছু বলা তো যায় না জীবন্মাত্র
শুনতে পাচ্ছি এই-আছে-আর-এই-নেই-নীর পদ্মপত্রে।
মিতাও যদি···ডাকবাক্সতে খামটা ফেলেই···
তাই যদি হয়, এই চিঠিটাও মরা তারার আলোর মতো?

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০)

সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিনদেশী

মাঠের মখমল থেকে তখনও যায় নি মুছে রোদ্দুরের শেষ কল্কাটুকু।
বিকেল আটটার মস্কো আলো-আঁধারির চৌরাস্তায়
এক হাতে রুখে দিয়ে ট্রলিবাস-ট্র্যাফিক-ঘর্ঘর
ঘরমুখো দিনান্ত, অশান্ত

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অন্য হাতে স্বাগত জানাল বিদেশীকে

—শুভসন্ধ্যা—
গোলাপির আভালাগা মেঘের নিশান-ওড়া সির্‌সিরে হাওয়ায়

: কে ছেড়ে এসেছ ঘর পুত্রকন্যা প্রিয়জন
জন্মের সংস্কার ছেড়ে কে খুঁজেছ মর্ম-সহোদর, খোঁজো
আত্মার স্বদেশ,
কালো শাদা বাদামি ও পীত
কে তুমি দূরের পাখি আমার কুলায় খোঁজো
ডানায় জড়িয়ে ঘাস ফুল অন্য অক্ষবৃত্ত দ্রাঘিমার ঘ্রাণ
দুরন্ত তৃষ্ণার আনচান,
দ্যাখো ছড়িয়েছি আমি পঞ্চদশ শাখা পাখা শাখার আশ্রয়-বাহু
পল্লবপুটেই জল
দ্যাখো ডেকে নিই দিক্‌দিগন্তের সহস্রেক ইস্পাত-কপোত
ফেরাই ওড়াই শতলক্ষ শ্বেত পারাবত আকাশে আকাশে মহাকাশে
দ্যাখো—এসো মিলে যাও মনের মেলায়
পাখি, আমি গ্রীষ্ম-সরোবর :

এই বলে ভিন্‌দেশীকে ডেকে নিল আজব শহর
অলৌকিক আবহে আবর্তে
গ্রাস করে নিল তাকে দ্রুতজলধার জনস্রোত
বাসে ট্র্যামে পাতাল সুরঙ্গে রেলপথে
ভিড় ও শিশুর কান্না সহযাত্রী পাঠমগ্ন তন্ময় প্রেমিক-যুগ ভিড়
লাঠিভর জরতীর বলিরেখা শ্রমের কঠিন চিহ্ন চোখে-মুখে যুবা
ভিড় ঠেলাঠেলি তবু বৃদ্ধাকে আসন ছাড়ে যুবা
ভিন্‌দেশীকে পথ দেখায় চঞ্চল তরুণী
হুড়োহুড়ি ভিড় ঠেলে উঠে আসে পাতালের মুখ
এস্‌কালেটরের ফণা দাপায় কেবলই

উঠে আসে তৃণাঙ্কুর বৃক্ষের ঊর্ধ্বগ বেগ
স্নেহ তেল-কয়লা-গ্যাস-মাটির নিশ্বাস গায়ে-মাখামাখি নিয়ে
বৈদ্যুত সুরঙ্গ থেকে সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিন্‌দেশী

উঠতেই ঝলমল করে ক্রেমলিন-চত্বর।
পাথর-প্রাকারে লাল অগুন্তি মিনারে ক্রেমলিন
ধরে রাখে রৌদ্রছায়া
লাল ভাগ্যতারা রক্ত-
পতাকায় পৃথিবীর
হাওয়ার নিশানা

দ্বারপ্রান্তে লেনিনকে রাখে।
ঘুরতে-ঘুরতে
স্বপ্ন-স্নানার্থীর ভিড় ঠেলে যেতে-যেতে
প্রাচীরের অন্যপ্রান্তে—ওকি
অজ্ঞাতসৈনিক-স্তম্ভে অগ্নিভুক এ-উৎসার কোন উৎস থেকে ?
কুণ্ডমুখে যুদ্ধোত্তর পুরুষের মেলা
শিশুর জটলা, আর
যুগলে-যুগলে সদ্য-দম্পতিরা এসে
সেইখানেই রেখে যাচ্ছে হৃদয় নৈঃশব্দ্য পুষ্পগুচ্ছ।

সহসা ভিন্‌দেশী বুঝি পেয়ে গেল প্রশ্নের উত্তর
গলে গেল সূর্য-তুষারের স্রোতে
পাতাল-রেলের স্রোতে পেট্রোল গ্যাসের পাশাপাশি
মিশে গেল এ মাটির নিচে বহ্নিমান
বিপ্লবের আরও এক স্রোতে।

নরেশ গুহ (১৯২৪)

স্বগত

চাই না, চাই না, চাই না তোদের, ফিরে যা তোরা,
শ্রাবণ-শোভন গগনে পবনে অলস বিলাসে পালক ওড়া,
অমল নীলায় মোহিনী লীলায় পাল তুলে ভাস।
আকাশ আমার কেউ নয়, সে তো দূরের আকাশ—
আরেক দেশের, আরেক গাঁয়ের, আরেক পাড়ার :
কত তার সখা চন্দ্রতারকা, নিদ্রাহারার
বন্ধুতা মেনে অপমান হবে ?
থাক-থাক, ঢের
হাসি-হাসি মুখ, আহ্লাদি ঢং দেখেছি তোদের
ফুটফুটে ফুল।
এই যে, বকুল, কখন এলে ?
কে না একদিন ছিল তোমাদেরই প্রাণের দোসর ? দু'দিনে সে-ছেলে
পর হ'য়ে গেল ! সাধু সাধু ! তবু কী যে ভালো নাম
মা-বাবা তোদের দিয়েছে, তাঁদের শতেক প্রণাম।

চাই না বৃষ্টি, চাই না দুপুরে ছলোছলো মেঘ।
নেবো না কুড়িয়ে সন্ধ্যার রেণু। যত ঝগড়াটি ঝড়ের আবেগ
ত্রিসীমায় আর দেবো না ঘেঁষতে। শিমুল শালিখ
দিক ধিক্কার, যত প্রাণ ভ'রে ধিক্কার দিক।

কত ভালো আমি বেসেছি তোদেরও, নিজের হাতের বাচাল আঙুল !
ফুলের শরীর ছেনেছিস তোরা, ছুঁয়েছিস তার জানুঢাকা চুল।
তার নীলখাম তোরা ছিঁড়েছিস, দিয়েছি ছিঁড়তে আমার আগেই :
বিশ্বাস নেই, নিজের শরিক শরীর তাকেও বিশ্বাস নেই।

বিশ্বাস নেই বিলাসী চোখেরে, হায়রে অন্ধ। সুরভিমত্ত
বিষয়ী নাসিকা, এই ঝরা বনে শোনাবো না কোনো পরমতত্ত্ব।
থাকো মূর্ছিত, থাকো ভাবে ভোর, স্বাধীন, স্ববশ, নির্বিশঙ্ক।
তোদের ছোঁবে না আত্মগ্লানির দীন হাতে ছানা পাপের পঙ্ক।
যখন চেয়েছ, যা চেয়েছ ঠোঁট, স্বার্থসাধক কান, ভীরু ত্বক,
সাধ মিটিয়েছি, ভাবিনি তোরা যে এত প্রতারক।
তোরা সৌখিন, তোদের কী দায়, তোরা তো বেকার।
সংসারে তোরা দিলিনে কিছুই, ইচ্ছে হলো না কিছুই শেখার।
আঁকিসনি ছবি, গড়িসনি গান, মৃত বিবর্ণ কঠিন পাথর
আঙুল বুলিয়ে হলো না কিছুই, কথা ছিল রূপ হবে!
আজ ফিরে যায় দেবতার যত বর।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪)

মৌলিক নিষাদ

পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।

এই এক আশ্চর্য সময়।
যখন আশ্চর্য বলে কোনো-কিছু নেই।

যখন নদীতে জল আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।
যখন পাহাড়ে মেঘ আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।
পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে, আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোনো-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে।

পিতামহ, আমি সেই দারুণ নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
মনে হয়, আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

মিলিত মৃত্যু

বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মহননের পথ
পরিষ্কার করে।

প্রসঙ্গত, শুভেন্দুর কথা বলা যাক।
শুভেন্দু এবং সুধা কায়মনোবাক্যে এক হতে গিয়েছিল।
তারা বেঁচে নেই।
অথবা মৃন্ময় পাকড়াশী।
মৃন্ময় এবং মায়া নিজেদের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেনি।
তারা বেঁচে নেই।
চিন্তায় একান্নবর্তী হতে গিয়ে কেউই বাঁচে না।

যে যার আপন রঙ্গে বেঁচে থাকা ভাল, এই জেনে—
মিলিত মৃত্যুর থেকে বেঁচে থাকা ভাল, এই জেনে—
তা হলে দ্বিমত হও। আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
তা হলে বিক্ষত হও তর্কের পাথরে।
তা হলে শানিত করো বুদ্ধির নখর।
প্রতিবাদ করো।

ওই দ্যাখো কয়েকটি অবিবাদী স্থির
অভিন্নকল্পনাবুদ্ধি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।
পরস্পরের সব ইচ্ছায় সহজে ওরা দিয়েছে সম্মতি।
ওরা আর তাকাবে না ফিরে।

ওরা একমত হবে, ওরা একমত হবে, ওরা
একমত হতে-হতে কুতুবের সিঁড়ি
বেয়ে উর্ধ্বে উঠে যাবে, লাফ দেবে শূন্যের শরীরে।

কলকাতার যীশু

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল ;
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাকসি ও প্রাইভেট্, টেম্পো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মতো শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টাল্মাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।
খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে ;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।

স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই ;
দু-দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টাল্‌মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯২৪)

সর্বজ্ঞ

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন,
এই মুহূর্তে আমি অনেক কিছুই টের পাচ্ছি।
আপনার ওই মূল্যবান টেরিলিন কিছুই ঢাকতে পারছে না,
এবং অ্যাটাচি-কেসের গালভরা লেবেল শুধু পণ্ডশ্রম।
আপনার সমুদয় ইচ্ছার অবয়ব আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কি
আপনার তৃষ্ণার নাম পর্যন্ত আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি।

অথচ বিশ্বাস করুন,
আমি সাধু, ফকির, জ্যোতিষী কিছুই নই, হবার ইচ্ছাও নেই,
যদিও আকাশের তারা বা ছায়াপথ সবই আমি পড়তে পারি,

এবং মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট আমার মুখস্থ,
রাশি-লগ্ন-দশা গণে বলে দিতে পারি।
কিন্তু এখন আমি সে-সবের উপর মোটেই নির্ভর করছি না,
তাছাড়া নক্ষত্র-বিচারের সময়ও এটা নয়।

এই মুহূর্তে আমি অনেক কিছুই টের পাচ্ছি।
আপনার হাসির মধ্যে বিষদাঁত এবং নখর
চোখে তিন তাসের খেলা, এবং হাতের মধ্যে এক রক্তাক্ত হাত
আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।
না, আপনাকে ব্ল্যাক-মেইল করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই,
ইচ্ছাও নেই ; আপনি লিখে নিন
আমি আপনার কোনো ডায়েরি পড়িনি, এমন কি
আপনি আদৌ কোনো ডায়েরি রাখতেন কিনা তাও জানি না ;
কিন্তু বাজি ধরুন, আমি ইচ্ছে করলে আপনার সব কিছু জিতে
নিতে পারি।
কারণ আমি সবই টের পাই, সবই টের পাচ্ছি।

আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন।
আমি মোটেই সাংঘাতিক লোক নই, যদিও
প্রয়োজনে ভয়ংকর হতে পারে এমন অনেক
বেপরোয়া যুবকের সঙ্গে আমার রীতিমতো হৃদ্যতা আছে ;
না, দয়া করে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করবেন না,
আর করলেও আমি বোলবো না।

তাছাড়া আপনিও এমন কিছু ধোয়া তুলসী নন।
আপনার পাউডার-পাফ বুলানো হাসির আড়ালে,
আপনার অনর্গল কথার স্রোতের তলায়—
আপনার চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি নেই,
কিন্তু আপনার মধ্যে আত্মগোপনকারী লোকটিকে
আমি হুবহু দেখতে পাচ্ছি,
যেমন হুবহু দেখতে পাচ্ছি আপনাকে এই পূজামণ্ডপের সামনে।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন,
কোনো কোনো মুহূর্তে আমি সর্বজ্ঞ।

রাম বসু (১৯২৫)

একটি হত্যা

ও যেখানে পড়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে।
জনহীন রাজপথ সংজ্ঞাহীন ট্রামের লাইন
এ পাশে নিষ্প্রাণ বাড়ি জড়সড় অন্ধকার মুখে
কয়েকটা পুলিশট্রাক, হেলমেট, রাইফেল, জীপ,
একটা শেলের শব্দ, মাটি ফেটে ধোঁয়ার নাগিনী
পাক খেয়ে উঠে পড়ে, শূন্যে দোলে চক্রময় ফণা।
রক্তাক্ত সে শুয়ে আছে পৃথিবীর সান্ত্বনার কোলে।

ওখানে রয়েছে শুয়ে গুলিবিদ্ধ একটা মানুষ
বুকে তার রক্তপদ্ম মুখে তার চৈত্রের পলাশ
অঙ্গ জুড়ে শান্ত নদী যন্ত্রণার গোলাপবাগানে
তাকে ঘিরে গাছ পাখি বসন্তের প্রকৃতি আকাশ।

একটা হত্যার রক্তে ভেসে গেল শহরের মুখ
চমকে নিভলো আলো। তারপর ঘন অন্ধকারে
তার খোলা চোখে এল আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ
সেই চোখে চোখ রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনীর।

ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬)

প্রিয়তমাসু

সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি—
স্বদেশের সীমানায়।

ধূসর তিউনিসিয়া থেকে স্নিগ্ধ ইতালী,
স্নিগ্ধ ইতালী থেকে ছুটে গেছি বিপ্লবী ফ্রান্সে
নক্ষত্রনিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো
দুর্নিবার, অপরাহত রাইফেল হাতে :
—ফ্রান্স থেকে প্রতিবেশী বার্মাতেও।

আজ দেহে আমার সৈনিকের কড়া পোশাক,
হাতে এখনো দুর্জয় রাইফেল,
রক্তে রক্তে তরঙ্গিত জয়ের আর শক্তির দুর্বহ দম্ভ,
আজ এখন সীমান্তের প্রহরী আমি।

আজ কিন্তু নীল আকাশ আমাকে পাঠিয়েছে নিমন্ত্রণ,
স্বদেশের হাওয়া বয়ে এনেছে অনুরোধ,
চোখের সামনে খুলে ধরেছে সবুজ চিঠি :
কিছুতেই বুঝি না কী ক'রে এড়াব তাকে ?

কী ক'রে এড়াব এই সৈনিকের কড়া পোশাক ?
যুদ্ধ শেষ। মাঠে মাঠে প্রসারিত শান্তি,
চোখে এসে লাগছে তারই শীতল হাওয়া,
প্রতি মুহূর্তে শ্লথ হয়ে আসে হাতের রাইফেল,
গা থেকে খসে পড়তে চায় এই কড়া পোশাক,
রাত্রে চাঁদ ওঠে : আমার চোখে ঘুম নেই।

প্রিয়তমাসু

তোমাকে ভেবেছি কতদিন,
কত শত্রুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীক্ষার অবসরে,
কত গোলা ফাটার মুহূর্তে।
কতবার অবাধ্য হয়েছে মন, যুদ্ধজয়ের ফাঁকে ফাঁকে,
কতবার হৃদয় জ্বলেছে অনুশোচনার অঙ্গারে
তোমার আর তোমাদের ভাবনায়।
তোমাকে ফেলে এসেছি দারিদ্র্যের মধ্যে,
ছুঁড়ে দিয়েছি দুর্ভিক্ষের আগুনে,
ঝড়ে আর বন্যায়, মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে
বার বার বিপন্ন হয়েছে তোমাদের অস্তিত্ব।
আর আমি ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে।
জানি না আজো, আছ কি নেই,
দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে
জানি না তাও।

তবু লিখছি তোমাকে আজ : লিখছি আত্মম্ভর আশায়
ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে।
জানি, আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা ক'রে নেই
মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গলঘটে ;
জানি, সম্বর্ধনা রটবে না লোকমুখে,
মিলিত খুসিতে মিলবে না বীরত্বের পুরস্কার।
তবু, একটি হৃদয় নেচে উঠবে আমার আবির্ভাবে
সে তোমার হৃদয়।
যুদ্ধ চাই না আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে :
পদার্পণ করতে চায় না মন ইন্দোনেশিয়ায়।
আর সামনে নয়,
এবার পেছন ফেরার পালা।

পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।

প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ ক'রে পেলাম কী ? উত্তর তার-
তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়,
ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব,
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র ;
আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা ।

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার ।।

প্রার্থী

হে সূর্য ! শীতের সূর্য !
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকব দিনগুলিব জন্যে ।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব !
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই !

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক-টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী ।

ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে যাই—
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।

কৃষ্ণ ধর (১৯২৬)

এক অলীক শহরের গল্পো

এ যেন এক অলীক শহরের গল্পো
তার ঘর বাড়িগুলো দেখতে ঝকঝকে
যেন বা ডানা মেলে এক্ষুনি উড়ে এসেছে
অন্য কোনো গ্রহ থেকে।

কৃষ্ণ ধর

তাদের এক ঝুল-বারান্দায় লম্বা জোব্বা আর মেঘের টুপি পরে
দাঁড়িয়ে শিস্ দিচ্ছেন শহরের মেয়র।

রাস্তায় রাস্তায় উজ্জ্বল রূপোলি আলোগুলো
কামরাঙা ফলের মতো
হেলমেটপরা ট্র্যাফিক পুলিশের মাথায় চুমু খাচ্ছে।
শহরের ট্যুরিস্ট নারীদের দিকে না তাকানোই এখন ভব্যতা
কেননা ওরা জন্মদিনের পোশাকে
স্নান করতে নেমেছেন নদীতে।
আশ্বিনের মেঘ দেখলেই
ওদের বাড়ির কথা মনে পড়ে যাবে
তখন ভিনাস ডি মিলোর ভঙ্গিতে জল থেকে উঠে এসে
নিজস্ব স্বর্গে ফিরে যাবেন লক্ষ্মী মেয়ের মতো
সবার হাঁ-করা মুখের ওপর দিয়ে।

অলীক শহরটা সেদিন খুব বেজার হবে তাদের ব্যবহারে
তার বুকটা টনটন করে উঠবে ব্যথায়।
ওরা ভাবতে থাকবে
কবে আবার পাখিরা আসবে তার সাজানো বাগানে
কবে তার গাছপালাগুলো আবার সবুজের কনসার্ট বাজাবে ভোরবেলা।

শুধু ফুটপাতের ভিখিরি শিশুটা
খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠবে তিনবার।
শহরের মেয়র তিন সত্যি করেছিলেন
ওকে এবার শীতে একটা কম্বল দেওয়া হবে।
সেদিন থেকে সে স্বপ্ন দেখে
সবার গায়ে রঙ-বেরঙের পশমের পোশাক
সেই শুধু ঠকঠক করে কাঁপছে বোকার মতো
মেয়রের ম্যাজিকে যদি তার সেই কাঁপুনিটা থেমে যায়
তাই সে হাততালি দিয়ে উঠল খুশিতে।

লোকনাথ ভট্টাচার্য (১৯২৭)

রাধিকা

এখানে আপাতত নীরবতাই—ভালো না লাগে তো ভুল করে এসেছেন,
ফিরে যান আপনার নিজস্ব কোলাহলে।

এখানে আপাতত প্রতীক্ষা, এই কাঁঠালিচাঁপারও গন্ধে—মাদুর
বিছানো মাটিতে, ফলমূল-মিষ্টি উপহার নিয়ে রেকাবিখানি
তৈরী। ওরাই আসেনি।

তবু না দেখলেও জানি কোথাও নিশ্চিত অজস্র হাঁটুর চাকা
চলছে, পাশের অশ্বত্থ অচিরেই পিছনের—শেষে বিন্দু
হয়ে মিলিয়ে যায়, কেবলি ঐ মিলায় দূরত্বের আকাশকে
ভালোবেসে।

ওরা আসছে-আসছে-আসছে, চোখ বুজে সেটা শুনছি
বলেই আমার দেয়ালে এই গাঢ় নীল মৌনের প্রলেপ,
ঠোঁটে তর্জনী তুলে সামনের অল্প জমির বাগানটায়
কাঁঠালিচাঁপাও কোন্ ভাস্কর্য, যেন যেতে যেতে হঠাৎ
থেমেছে অভিসারিকা রাধিকা।

অর্থাৎ আমারও একটা কোলাহল ঘনিয়ে এল বলে, এবং
এখনই চাইলে শঙ্খে কান পেতে সমুদ্র শোনার মতো
অনেক গলার খিলখিল হাসির সরোদ আপনিও শুনতে পেতেন।

শুনতে চান না, এই তো? ফিরে যাবেন আপনি নিজস্ব কোলাহলে।

পুকুরে পিতার মুখ

আমার পিতা পুকুরের পাড়ে বসতে
বড়ই ভালবাসতেন
সারাদিন ক্লান্তির শেষে সন্ধ্যায়
এখানে বসলে শরীর জুড়িয়ে যেত
পুকুরের পাড়টি তাঁর প্রিয়তম স্থান।
পবিত্রও।

দেখেছি তাঁকে, বাইরে থেকে সাইকেল হাঁকিয়ে
দরজায় পেঁছে ডাকতেন মাকে, 'সোহাগী, সোহাগী'
জামায় জবজবে ঘাম, মুখে ক্লান্তির ছায়া,
সাইকেলটি থাকতো বারান্দায় ঠেঁস দেয়া
সটান চলে যেতেন তিনি পুকুরের পাড়ে
লিচু তলার ছায়ায়,
যেখানে প্রতীক্ষিত তাঁর সমগ্র স্বস্তি
কখনো নেমে যেতেন জলের গভীরে
সন্তরণ থেকে কুড়োতেন তৃপ্তির গুচ্ছ।

লাঠি খেলায় আব্বার খুব নাম ডাক ছিল
দু'চার দশজনকে সামলাতেন অনায়াসে
হাত যশ ছিল চিকিৎসায়—
সারাদিন পাল্‌সেটিলা, কষ্টিকাম, ট্যারেন্টুলা
তাঁর চোখের সামনে যেন এক একজন মানুষ
কথা বলছে, অস্বস্তি বোধ করছে, ফন্দি আঁটছে,
কেষ্ট এবং নীলমনি ঘটক তাঁর অবগাহনের আরেক জলধি।
দূর দূরান্তে যেতেন সাইকেলে
ফিরতেন পরিশ্রান্ত, কিন্তু নেতানো নয়.

মেরুদণ্ডটি ছিল বড় মজবুত, তাঁর ব্যক্তিত্বের মত।
ফিরেই যেতেন লিচু তলায়
কালো জলে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতেন, যেন দেখতেন
পিতৃ পিতামহের প্রতিবিম্বিত মুখ
চোখের সামনে কথা বলতো অনেক অতীত,
'বড় সখ করে দাদা মিয়াই কেটেছিলেন পুকুরটা'
বলতেন একটু শ্বাস দীর্ঘ করে।

একাত্তরের জুলাইটি হায়েনা হয়ে
আমাদের গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
আমরা সবাই ছিটকে গেলাম
আমার ভাগে মা আর ছোট বোন দুটো
বড় ভাই আর আব্বা যে কোথায় কোন্‌দিকে বিচ্ছিন্ন হলেন!

তিনটি মাস আমরা গ্রামমুখী নই
আর্তনাদ এবং মৃত্যু, মৃত্যু এবং ধ্বংস
গ্রামটি ধর্ষণে ধর্ষণে অবসন্ন
নিজদেশে আমরা সবাই পরবাসী
নিজগৃহে ফেরারী আসামী পলাতক অপরাধী
—সে এক অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতম ঘটনার
জীবন্ত সাক্ষী হবার বিরল দুর্ভাগ্য আমাদের।

কানে খবর এলো একদিন, দুঃসংবাদ যেমন আসে,
আব্বাকে ওরা হত্যা করেছে
জ্যান্ত অবস্থায় পুকুরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
পুকুরের মায়া তিনি ছাড়তে পারেন নি
পাশের গ্রাম থেকে মাঝে মাঝেই নাকি আসতেন
বসতেন লিচু তলায়, চেয়ে থাকতেন সচকিত,
সন্ত্রস্ত-সন্তরণে নেমেই ধরা পড়লেন

অরবিন্দ গুহ

হত্যার সময় ওরা বলেছিল, "পিণ্ড বাঙ্গালী,
পিণ্ড, ইয়ে দরিয়া কা পানি বহুত মিঠ্যা হ্যায়।"
ফিরে এসে আব্বাকে আমরা কবরস্থ করেছি
আব্বাকে নয়, আব্বার কংকালকে
যেটি জড়িয়ে ধরে মা সংজ্ঞাহীনা
ছাড়বেন না কিছুতেই
বোন দুটোও, তিনজনেই আব্বার খুব কাছের মানুষ।

পুকুরের জলে চোখ রাখলেই
সহজেই চোখে পড়ে সেই দুটো চোখ
একটি মুখমন্ডল—শ্রান্ত অথচ ধীর, গম্ভীর,
যেন তিনি এখনো অপলক কালো জলে চেয়ে আছেন
আর্ত চিৎকারে বলছেন, "আমি যাব না,
এখান থেকে যাব না কোথাও।"

আব্বাকে সত্যি পুকুরের পাড় থেকে
আর নেয়াই গেল না।

অরবিন্দ গুহ (১৯১৮)

হত্যাকারী

একজন সার্থক হত্যাকারীর সঙ্গে
নির্জনে দেখা করার বড়ো সাধ হয়।
বিশাল, বিশাল পাহাড়ের পথে
এক ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধতায়
যেন তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়।

যাকে হত্যা করেছিল
তার চেয়েও করুণ, ছিন্নভিন্ন, সর্বস্বান্ত
শরীর—
এই হত্যাকারী।
অথচ
কোনো পুলিশের বড়োকর্তা তাকে
স্পর্শ করতে পারে নি ;
কোনো আদালতে তার
বিচার হয় নি।
পাহাড়ের উদ্দাম অরণ্যে
দ্বিপ্রহরের আকাশের তলায়
রাত্রির মতো আচ্ছাদিত মুহূর্তে
তাকে আমি দু-হাত ধরে প্রশ্ন করতাম :
ভাই, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে
সেই নিহত মানুষটি
শেষ নিশ্বাসের ভাষায়
কাকে অভিশাপ দিয়েছিল—
তোমাকে, না, ঈশ্বরকে ?

শামসুর রাহমান (১৯২৯)

এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?
এখানে তো বোনাস ভাউচারের খেলা নেই কিম্বা মায়া
কোনো গোল টেবিলের, শাসনতন্ত্রের ভেল্‌কিবাজি,
সিনেমার রঙিন টিকিট

শামসুর রাহমান

নেই, নেই সার্কাসের নিরীহ অসুস্থ বাঘ, কসরৎ দেখানো
তরুণীর শরীরের ঝলকানি নেই কিম্বা ফানুস ওড়ানো
তা-ও নেই, তবু কেন এখানে জমাই ভিড় আমরা সবাই ?

আমি দূর পলাশতলীর
হাড্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক
মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধূ-ধূ,
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড় বাদলের
নিত্য-সহচর,
আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতী সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি, বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাঁতে,
আমি
রাজস্ব দফতরের করুণ কেরাণী, মাছি-মারা তাড়া-খাওয়া,
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ,
আমি নব্য কালের লেখক,
আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী
নিত্য করে আসা-যাওয়া, আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন হাঁস ভাসে নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।
আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?
কোন্ সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই

ফাল্গুনের রোদে ? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির।

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া আর পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে,
জীবন মানেই
টেপির মায়ের জন্যে হাট থেকে ডুরে শাড়ি কেনা,
জীবন মানেই
বইয়ের পাতায় মগ্ন হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে
অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা,
জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা,
জীবন মানেই
মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা রেখে শৈশবের নানা কথা ভাবা,
জীবন মানেই
খুকির নতুন ফ্রকে নক্সা তোলা, চারু লেস্ বোনা,
জীবন মানেই
ভায়ের মুখের হাসি, বোনের নিপুণ চুল আঁচড়ানো,
প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গোঁজা ;

শামসুর রাহমান

জীবন মানেই
হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা,
জীবন মানেই
গলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুমুকে চুমুকে জলপান,
জীবন মানেই
রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো,
জীবন মানেই
স্ফুলিঙ্গের মতো সব ইস্তাহার বিলি করা আনাচে কানাচে
জীবন মানেই......................
আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হ'য়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়—ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।

এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রঙ,
যে রঙ লাগে না ভালো চোখে, যে-রঙ সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল সন্ধ্যায়—
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রিদিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,

সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

পথের কুকুর

অবশ্য সে পথের কুকুর। সারাদিন
এদিক ওদিক ছোটে, কখনো-বা ডাস্টবিন খুঁটে
জুড়ায় জঠরজ্বালা, কখনো আবার প্রেমিকার
মনোরঞ্জনের জন্য দেয় লাফ হরেক রকম।
হাড় নিয়ে মুখে বসে গাছের ছায়ায়,
লেজ নাড়ে মাঝে-মধ্যে ফূর্তিবাজ প্রহরে কখনো
ধুলায় গড়ায়। কখনো সে
শূন্যতাকে সাজায় চিৎকারে।

আমি বন্দী নিজ ঘরে। শুধু
নিজের নিঃশ্বাস শুনি, এত স্তব্ধ ঘর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী

ঠায় ব'সে আছি
সেই কবে থেকে। আমি, মানে
একজন ভয়ার্ত পুরুষ,
সে, অর্থাৎ সন্ত্রস্ত মহিলা
ওরা, মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক-বালিকা—
আমরা ক'জন
কবরের স্তব্ধতা নিয়ে ব'সে আছি। নড়ি না চড়ি না
একটুকু, এমন কি দেয়ালবিহারী টিকটিকি
চকিতে উঠলে ডেকে, তাকেও থামিয়ে দিতে চাই,
পাছে কেউ শব্দ শুনে ঢুকে পড়ে ফালি ফালি চিরে মধ্যবিত্ত
নিরাপত্তা আমাদের! সমস্ত শহরে
সৈন্যেরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান
এবং চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র। মরছে মানুষ
পথে ঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী
ঠায় ব'সে আছি
সেই কবে থেকে। অকস্মাৎ কুকুরের
শাণিত চিৎকার
কানে আসে, যাই জানলার কাছে, ছায়াপ্রায়। সেই
পথের কুকুর দেখি বারংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাইরঙ
একটি জীপের দিকে, জীপে
সশস্ত্র সৈনিক কতিপয়। ভাবি, যদি
অন্তত হতাম আমি পথের কুকুর।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩১)

আত্মসমর্পণের পর

দুই রাজ্য জুড়ে সশস্ত্র বাহিনী
বছরের পর বছর
দিবারাত্র, তন্নতন্ন
খুঁজছে এক অসুন্দর রমণীকে,
তার কাঁচা মাথার দাম দশ হাজার টাকা ।
হিংস্র হঠকারী একদল পুলিশ পুরুষ
জঙ্গল থেকে জঙ্গলে
টিলা থেকে টিলায়
তোলপাড় করছে জানোয়ারদের জগৎ,
কোথায় সেই বাইশ বছরের খুনী মেয়েটা ।
এদিকে
বনের মধ্যে পাখিদের শান্তিভঙ্গ
টিপটিপ জোনাকির আলো, বৃষ্টি, পাতা ঝরছে খশখশ
আর মেগাফোনে ফুলন দেবীর আহ্বান :
"দারোগাজী, দারোগাজী
গোলিয়াঁ না হো তো গোলিয়াঁ লে যাও,
হিম্মৎ না হো তো চুড়িয়াঁ লে যাও"

ফুলন দেবী আত্মসমর্পণ করেছেন ।
এখন গণতন্ত্রী দেশে সভ্য মানুষের দল
যুক্তি দিয়ে, আইন দিয়ে, প্রেম দিয়ে খুব ভদ্রভাবে
তাঁকে বাঁধবে ; বাঁধুক,
কাপুরুষদের ঘৃণা করতে করতে
বাঘী ফুলন দেবী এখন ক্লান্ত ।

সুনীল বসু (১৯৩০)

কথাগুলো স্রেফ কথাগুলো

কথারা ভারী মজার জিনিস, মশাই—
কথাগুলো লাফায় হাসে
কাঁদে ভ্যাংচায়

সেদিন এক ভদ্রলোক একটা
কথার বল ছুঁড়ে মারলেন একজনকে
অমনি তিনি কথার একটা ক্ষ্যাপা কুকুর
লেলিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ
তারপর বল আর কুকুরের ঝাপ্টাঝাপ্টি
কামড়াকামড়ি
দৌড়োদৌড়ি
লড়াই !

কথারা ভারী মজার চরিত্র
মশাই
দু'তলা থেকে এক ঝাঁক কথা
ছুঁড়ে মারলেন এক রূপবতী
তার স্বামীকে
থালা-বাসনের মতো ঝন ঝন করে
ভাঙতে ভাঙতে কথাগুলো চুরমার হয়ে
নীচে পড়তে লাগল
কি মজার চরিত্র কথারা—
কথাগুলো হাসে কাঁদে লাফায়
কথাগুলো বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে
হরিণ-শিশুর মতো নিরীহ কথার
ঘাড়ের উপর
তারপর চলে
জাপ্টাজাপ্টি
খামচাখামচি
লড়াই।

আন্তিগোনে

(কেয়া চক্রবর্তীকে)

একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়তে পারে না একবার   একবারো
তাবৎ সংসার ?

শঙ্করী পালের মতো মুখাবয়বহীন রমণীর অপ্রয়োজন ?
ঘাড় ধ'রে নিয়ে এসে,—অবশ্য স্তন ও উদর ছাড়া
যদি থাকে অতিরিক্ত ঘাড়

একবার, শুধু একবার
চুম্বন করাতে চাই আন্তিগোনে
তোমার ওই কলাপাতারঙ্ পোশাকের পুণ্য প্রান্তদেশ !

আন্তিগোনে ? তুমি কি জানতে পেরেছিলে ?
না না আন্তিগোনে, ওরা, পুরুষেরা, মনে মনে
সমস্ত, সবাই হিসেবী ক্রেয়ন ওরা

তাবৎ সংসার শুধু অলীক আঠায় জোড়া দিতে চায়
আমি চাই কেবল তোমার আত্মা যা চায় !   যা চায় !
আন্তিগোনে !

আমি ওই সর্বগ্রাসী লোভী মেয়েদের
যাদের সমস্ত চাই, সব চাই, সতীত্ব এবং পরকীয়া
একসঙ্গে সতীচ্ছদ চাই, সব চাই, সতীত্ব এবং পরকীয়া
একসঙ্গে সতীচ্ছদ, এবং রমণ, এমন কি বাৎসায়নও যাদের বিধান দেন

দিনে সতী রজনীতে বেশ্যা বনে' যেতে (ইতিগজঃ স্বামীর সকাশে)

আন্তিগোনে !
তুমি কেন সতেরো বছরে তবে জেনে গেলে

কবিতা সিংহ

•

ওইসব শূকরীরা মনোমতো রান্নাঘর, সমর্থ পুরুষ আর
স্তনের দুধের শারীর যন্ত্রণা ভার কমাবার মতো শিশু পেলে
থামাবেই সমস্ত চিৎকার, শুধু রেখে দিয়ে তার আদি খুনসুটি ?

আন্তিগোনে ! তুমি কেন সতেরো বছরে জানতে পেরেছিলে সব ?
লোভ এক ছুরি—লোভী হতে নেই—লোভ কুটিকুটি সব দাঁতে কাটে
জন্মদিনের বড় নিটোল চাঁদের মতো কেক্
সে কেবল খণ্ড খণ্ড করে ।
সমস্ত পুরুষ করে জননী গমন, শুধু স্বীকারোক্তি করে ইডিপাস ?
তাই আন্তিগোনে, অত সকাল সকাল, কিংবা সকালেরও আগে
নাকি রাতে ? নাকি জন্মের সময়—নাকি পিতার জ্যোতির্ময়
ঔরসেই ভাসমান ব'সে

তুমি বুকে রেখেছিলে মৃত্যুবীজ তীব্র সহজাত ?
যেভাবে, স্বভাবে, বুকের ভিতর বয়, মিথ্যার যন্ত্রণা কিছু
স্বতন্ত্র ঝিনুক !

আন্তিগোনে !
তোমার উন্নত বুকে ঈশ্বরেরো ছিল আয়োজন
তোমার বস্তির সুগঠনে থেবাই-এর অনাগত নৃপতির
প্রথম দোলনা !
তবু তুমি ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলে দুধের ধারার সেই নিঃসরণ-সুখ
প্রসবের দুষ্প্রাপ্য আস্বাদ
কারণ তুমি যে ওই সতেরোর ভীষণ সকালে
জেনেছিলে সত্যিকার কিছু পেলে কিছু,—কিছু তো ছাড়তেই হয়
মাংস ও শরীর ।

আন্তিগোনে, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃ-গমন
স্বীকার সাহস রাখে শুধু ইডিপাস
আর একমাত্র সেই ইডিপাসই
জন্ম দিতে জানে তোকে, তোকে আন্তিগোনে !

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২)

পুনর্বাসন

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ঘাসপাথর
সরীসৃপ
ভাঙা মন্দির
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
নির্বাসন
কথামালা
একলা সূর্যাস্ত
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বংস
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিম মুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন।

যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শেয়ালদা
ভরদুপুর
উলকি দেয়াল
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
কানাগলি
শ্লোগান
মনুমেণ্ট
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শরশয্যা

ল্যাম্পোস্ট
লাল গঙ্গা
সমস্ত একসঙ্গে ঘিরে ধরে মজ্জার অন্ধকার
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজে জলতরঙ্গ
চূড়োয় শূন্য তুলে ধরে হাওড়া ব্রিজ
পায়ের নিচে গড়িয়ে যায় আবহমান।

যা কিছু আমার চারপাশে ঝর্ণা
উড়ন্ত চুল
উদোম পথ
ঝোড়ো মশাল
যা কিছু আমার চারপাশে স্বচ্ছ
ভোরের শব্দ
স্নাত শরীর
শ্মশানশিব
যা কিছু আমার চারপাশে মৃত্যু
একেক দিন
হাজার দিন
জন্মদিন
সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে
অল্প আলোয় বসে থাকা পথভিখারি
যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন।

বাবুমশাই

আশা করি সকলেই বুঝবেন যে এই ধরনের
রচনা পড়বার বিশেষ একটা সুর আছে ॥

'সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা !
বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তাছাড়া ভাই

আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা

যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নিচু জনে'
—কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশয়

মিত্র বাবুমশয় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই,
মাঝেমধ্যে ভাবেন তাদের নুন আনতে পান্তাই
নিত্য ফুরোয় যাদের

'নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলার কুকুর
সেটা হয় না বাবা

সেটা হয় না বাবা' বলেই থাবা বাড়ান যতেক বাবু
কার ভাগে কী কম পড়ে যায় ভাবতে থাকেন ভাবুক
অমনি দু'চোখ বেয়ে

অমনি দু'চোখ বেয়ে অলপ্পেয়ে ঝরে জলের ধারা
বলেন বাবু 'হা, বিপ্লবের সব মাটি সাহারা'
কুমীর কাঁদতে থাকে

কুমীর কাঁদতে থাকে 'আয় আমাকে নামা নামা' ব'লে
কিন্তু বাপু আর যাব না চরাতে-জঙ্গলে
আমরা ঢের বুঝেছি

আমরা ঢের বুঝেছি খেঁদীপেচী নামের এসব আদর
সামনে গেলেই ভরবে মুখে, প্রাণ ভরে তাই সাধো
তুমি সে-বন্ধু না

তুমি সে-বন্ধু না, যে-ধূপধুনা জ্বলে হাজার চোখে
দেখতে পাবে তাকে, সে কি যেমনতেমন লোকে
তাই সব অমাত্য

তাই সব অমাত্য পাত্রমিত্র এই বিলাপে খুশি
'শুঁড়িখানাই কেবল সত্য, আর তো সবই ভূষি
ছি ছি হায় বেচারা'

ছি ছি হায় বেচারা ? শুনুন যাঁরা মস্ত পরিত্রাতা
এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা
হেঁটে দেখতে শিখুন

হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়
সাহেব বাবুমশায় !

আলোক সরকার (১৯৩২)

অভিসার

আলস্যরঞ্জিতা তোমার কুঞ্জবনে এই অভিসার।
পথ বর্ষণমুখরিত নয় সর্পসঙ্কুল অরণ্যময়
প্রতিবন্ধকতা দূরস্থিত স্মৃতি, অনুপস্থিত রৌদ্রময়তার
স্মৃতিউজ্জীবনী ভবিষ্যউদ্ভাসনী সন্ত্রাসকুটিল দহন।
ইঙ্গিতসঘন প্রিয়
সমগ্র বিশ্ব মৌন অবলুপ্তি ক্রমঅপসৃয়
বর্ণময় আলেখ্য রক্তময় প্রস্তাব বিদ্যুতি উচ্চারণ।
নিস্তব্ধতা স্ফুরিত বিস্মৃতি নিঃস্ব বিবর্জিত উপস্থিতি
মেঘময়তায় তন্দ্রানিলীন উজ্জীবন, ভাবময় দ্যোতনা।
শ্যামলিম পথ অর্পিত অভিসার
ম্লান জ্যোৎস্নালোকে শাশ্বত সময় একটি সম্ভার—
অশ্রম অপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষাহীনতা।
অনুশাসিত অতীত নয় বাসনা নির্দেশিত ভবিষ্যৎ নয়
অনুষঙ্গরিক্ত এই বর্তমান প্রবহমানতা।
আলস্যরঞ্জিতা তোমার কুঞ্জবনে অনন্তকাল
চৈতন্যবিলুপ্ত আমার যাত্রা, আমার সমগ্রতা।

পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩২)

গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল

গভীর রাতের সমস্ত ট্রাঙ্ককল
যাতায়াত করে আমার ভিতর দিয়ে।

আর
অসংখ্যবার
হ্যালো হ্যালো বলতে বলতে
হাঁপিয়ে যাই
আর ভাঙা মোমবাতির মতো
এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি সমস্ত রাত।
চারপাশের শাদা দেয়াল
সবুজ জানলা
হলুদ দরজা
এমনকি কালো চেয়ার টেবিলগুলোও
হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে আসে সামনে।
ট্রাঙ্ককলের মানুষ কী ভাষায় কথা বলে
শুনতে চায় ওরা।
ওরা মাছ পাখি এবং গাছপালার ভাষা জানে
এবং পড়তে পারে মেঘের স্বরলিপি।
সরু জলের রেখা পাছাপেড়ে শাড়িতে
যখন বনের ভিতর
নুড়ির নূপুর বাজিয়ে,
অথবা পাতলা হাওয়ারা যখন
গাছের ছায়ার
আলপনা দেয় দেয়ালে,
ওরা তাদের সঙ্গে গল্প করে।
এমনকি
মানুষের বহু সংলাপও ওরা চেনে
সেইসব মানুষের
যাদের কাঁধে গভীর ক্ষতের দাগ
চোখে
পুড়ে-যাওয়া বনের ছাই
পায়ের পাতা
অবেলার বৃষ্টিতে ভিজে।

ট্রাঙ্ককলের মানুষের কাথাবার্তা শুনবে বলে
এমনভাবে ঝুঁকে থাকে ওরা
আমি নিশ্বাস নিতে পারি না,
চশমা পরেও সরাতে পারি না
সামনের অস্পষ্টতা।
সমস্ত রাত
অর্থাৎ
যতক্ষণ ঝাউ-এর মাথায় কালপুরুষ
যতক্ষণ অন্ধকারে আদিম সব স্বপ্নের
রাজসভা
যতক্ষণ
পুরুষ জোনাকির সঙ্গে
মেয়ে জোনাকির ভালোবাসাবাসি
যতক্ষণ
মশারির মধ্যে পৃথিবীর আস্ত মানুষগুলো
খোসা ছাড়ানো ফলের মতো বেআব্রু
আমি ভাঙা মোমবাতির মতো
এক পায়ে।
হ্যাঙারে আমার টেরিলিন
পরা হয় না।
বিছানায় আমার উর্বশী
ছোঁয়া হয় না।
জানলায় অফসেটে-ছাপা আকাশ
দেখা হয় না।
গভীর রাতের সমস্ত জরুরি ট্রাঙ্ককল
আমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে এইভাবে
যাতায়াত করে কেবল।

২

ট্রাঙ্ককলের ভিতরে আমি শুনতে পাই
প্রবল সব উড়োজাহাজের
আকাশ-ছেঁড়া চিৎকার।
কার উপর ওদের রাগ
জানি না।
ট্রাঙ্ককলের ভিতরে সার সার সাঁজোয়া গাড়ির
দূরপাল্লা চোখ
আগুন ছিটিয়ে যায় বাতাসে।
কার উপর ওদের আক্রোশ
জানি না।
শুনতে পাই।
মৃত হরিণ শিশুদের ফুঁপিয়ে কান্না,
ঘর-পোড়ানো আগুনের
খিলখিল হাসি,
আর ধ্বসে পড়ছে যে-সব ঘরবাড়ি।
খামার এবং মন্দিরের লম্বা চুড়ো
তাদের হাড়গোড়ের কাতরানি,
তেষ্টায় শুকিয়ে শুকিয়ে যাওয়া
এক-একটা নদীর
নীল কণ্ঠনালীর আর্তনাদ।
দেখতে পাই না
কিন্তু মনে হয়
ক্রমশ কালো হয়ে আসছে
রক্তের হিরণ্ময় ফোঁটাগুলো,
দেখতে পাই না কিন্তু মনে হয়
ধুলো এবং ঘাস অবিকল জননীর মমতায়
রক্তের মৃত ফোঁটাগুলোকে

তুলে নিচ্ছে নিজেদের কোলে-কাঁখে।
আচমকা দাঙ্গা-হাঙ্গামায়
যেমন লুটপাট হয়ে যায়
সোডার বোতল,
সেইভাবেই মানুষের মুঠো থেকে
চুরি হয়ে যাচ্ছে
ভোমরাসুদ্ধ সোনার কৌটোগুলো।

একটু চুপ করুন।
প্লীজ, একটু আস্তে।
এখন পাঁচতারা হোটেল থেকে
এক সোনা-বাঁধানো দাঁত
কথা বলছেন
এক হীরে-বাঁধানো আঙুলের সঙ্গে।
হীরের আঙুলটি
এক জরির মুকুট-পরা মন্ত্রী মহোদয়ের
বড় স্নেহভাজন।
এখন মন্ত্রী কথা বলছেন তাঁর
কম্পিউটার-চালিত সেক্রেটারির সঙ্গে।
সেক্রেটারি কথা বলছেন
ডানলোপিলোর মতো গড়ানো যায়
এমন মৎস্যকন্যার সঙ্গে
যিনি ডুবে আছেন বাথটাবের বুদ্‌বুদে।
কত রকমের মুখোস-আঁটা শব্দ
ইশারা-ইঙ্গিত
পাকা-মাছের ঘাই
আলজিভের টরে-টক্কা

গভীর রাতের এইসব ট্রাঙ্ককলে।
শব্দের বিষয়ে আমি আরো অনেক কথা
বলতে পারি আপনাদের।
এমন সব জাহাজের ভোঁ শোনাতে পারি
অথবা এমন সব ঘুঘুর ডাক
যা এক-একটা দিন-দুপুরকে
ঝাঁঝরা করে দিতে পারে যুদ্ধের সাইরেনে।
একটু চুপ করুন,
প্লীজ, একটু আস্তে।
এইমাত্র খবর এসেছে
ভেঙে গেছে ইন্দ্রপ্রস্থের গোল প্যাণ্ডেল।
ভেড়ার প্রস্তাবে শুয়োর রাজী নয়।
শুয়োরের প্রস্তাবে ছাগল রাজী নয়।
ছাগলের প্রস্তাবে ছুঁচোরা রাজী নয়।
আমাদের দেশে রাজ-সিংহাসন বলতে
একটাই
যার উপরে অশোকস্তম্ভের তিনটি সিংহের মুখ
তিনদিকে।
ভেড়াকে সিংহাসন এবং লাল কার্পেট দিতে
শুয়োরেরা
শুয়োরকে সিংহাসন এবং নীল পাশপোর্ট দিতে
ছাগলেরা
ছাগলকে সিংহাসন এবং সিঁদকাঠি দিতে
ছুঁচোরা রাজী নয়।
এখন এঁরা ফিরে যাবেন যে যার
মুল্লুকে।
মুল্লুকে গিয়ে এঁরা হয়ে যাবেন এক একটি
হলুদ ডোরার বাঘ অথবা
প্রকাণ্ড মাথাওয়ালা সিংহ।

ফিরে গিয়েই ভাড়া করবেন তাঁবু-সুদ্ধ সার্কাস,
বর্ণাঢ্য সব তাসাপার্টি,
তারপরই শুরু হবে
এঁদের নাচ এবং নকশা
এবং নিলাম।

বন্ধুগণ!
আমি সিংহাসনে নেই
দেখুন দেখুন
কী হাড়ির হাল হয়েছে সোনার ভারতবর্ষটার।
দেখুন দেখুন
প্রত্যেকের ভাতে এক-ডজন মাছি।
প্রত্যেকটি দাঁতের গোড়ায় রক্তপুঁজময়
পায়োরিয়া।
বন্ধুগণ!
আমার হাতে তুলে দিন আপনাদের
সিন্দুকের চাবি এবং
সরল বিশ্বাস এবং......
বলতে বলতেই পরের দিনের কাগজে
এঁরা হেডলাইন।

দেশে এখন বিশুদ্ধ ঘৃতের
ভেজালহীন টিন বলতে এঁরাই।

এঁরাই ঈশ্বর-প্রেরিত সেই হামানদিস্তে
যা একই সঙ্গে এলাচ, এবং লবঙ্গ
এবং কালোজিরের সঙ্গে আমচুর
এবং ধানী-লঙ্কার সঙ্গে ধুতরোবিচি
থেঁতো করে বানিয়ে চলেছে
এক অত্যাশ্চর্য
বীজাণুনাশক সার।

তুলকালাম মশলা-ব্যবসায়ী হিসেবে
এ'রা প্রত্যেকেই এক-একটি ভারতভূষণ।

৪

পৃথিবীর আসল মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে
তখন
পৃথিবীকে
আমাকে
পৃথিবীর সুকল্যাণ বাতাসকে ভেদ করে
গভীর রাতের ট্রাঙ্ককলের তোলপাড়
দাবাখেলা।
গভীর রাতের ট্রাঙ্ককলে
কেউ কেউ পেয়ে যাচ্ছে সোনার মেডেল
কেউ কেউ বাইজীসুদ্ধ বাগানবাড়ি
আর কেউ কেউ
নিজের জমিজমা থেকে উৎখাতের
নীল নোটিশ।
হাঁপিয়ে উঠেছি আমি
অবিরল ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের
উদ্‌গারে।
বিস্ফোরণের আগে
আগুনে-বয়লারের মতো
ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠছি আমি।

আনন্দ বাগচী (১৯৩৩)

ফেরী

পুরনো স্কটিশ চার্চ, ডাকবাংলা, পল্লবিত অর্কিড রোদ্দুর,
নাগরদোলায় ঝুলছে অন্ধনারী, প্রাক্তন বেদনা
ভূতুড়ে সময় খেলে গঙ্গাজলে, উল্টোপাল্টা জলস্রোত ছুঁয়ে
দরজার নম্বরে, নামে, ডাকনামে, অবিস্মরণীয় কবিতার
আত্মহত্যাকারী সব বিচিত্র লাইনে ; বেলা যায়।
চকমকি কলকাতা বুকে তাপ দিয়েছে বহুকাল থেকে
নিমতলা লেনের বাড়ি, বাগবাজার, উনিশ বছর
প্রথম চিঠির মত কৈশোরের ডাকবাক্স ভরা
দিনগুলি রাতগুলি চলে গেছে চক্‌খড়ি মুছে রেখে।

সমস্ত খোয়াই স্মৃতি, স্টোন চিপস্‌, ক্যাকটাস এখন
সমস্ত গল্পের গিল্টি, মারাত্মক ভালোবাসাগুলি
আমার সর্বস্ব কেড়ে নিল।
হল না প্রতিমা গড়া, প্রত্যক্ষ পুতুল, কোন কিছু
নক্ষত্রের দিকে চেয়ে নিঃসঙ্গতা চিনেছি এখন
দুরারোগ্য সাহিত্যকে বুকে নিয়ে উত্তাল তিরিশে
জল পড়ে পাতা নড়ে অন্ধকারে, বিশল্যকরণী অন্ধকারে
মর্গ থেকে ফিরে এল নষ্টচাঁদ যৌবন কুড়িয়ে।

২

মানসীর গান শুনি না কতদিন, রেডিয়ো খুলি না
হাতের ছড়ানো তাস, ক্যারমের ঘুঁটি, সহোদরা
বোনগুলি, পটে লেখা, দিল্লিবাংলা জুড়ে নানাখানে ;
ভিলাই রাউরকেলা দুর্গাপুরে উন্মাদ বন্ধুরা
মাঝে মাঝে ডাক পাঠায়,
চমকে উঠি পোস্টেজ জলছবি।

কলকাতার পান্থশালা পড়ে থাকল, রাত দশটার বাসে চড়ে
হুইলের সুতোমুখে ফিরে যাই,
আবার আবার ফিরে যাই ;
কিছুই থাকে না প্রিয়, প্রিয়তম, নিশ্বাসের মত।
বাসের জানলায় বসে মুখ রেখেছি অন্ধকরতলে
হাওড়ার ব্রিজ থেকে হাওয়া আসছে উথালপাথাল,
ডালহৌসি শুয়ে আছে জি পি ও-র বিনিদ্র ঘড়িতে
হঠাৎ ডাকনাম শুনে চমকে জেগে উঠি
হাওড়ার সুনীল হাজরা ঈশ্বরী পাটনী চেয়ে আছে।

ফিরতে পারে না কেউ অনাসক্ত বেদনায় মুখ ঢেকে রেখে, জানলাম।।

নিখিলকুমার নন্দী (১৯৩৩)

দিনগত

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাবো তাই জীবনগানে।

একথা ভেবেই যৌবন হল উতল বাউল
কূলের কান্না দু'হাতে সরিয়ে ধরল অকূল।

মনে পড়ে সেই কুয়াশাকরুণ ভোরবেলাকার
জমানো পাড়ি
নদীতে নদীতে। হায় সেখানেও প্রতিকূলতার
হাওয়া একাকার ভাঙল হাল, ব্যর্থ দাঁড়ী।
সেই নদী যেই দারুণ দুপুরে সাগরে মিশলো আশ্রয়বাঁক
হারালো। ধূসর ঘনগর্জন সফেন স্বরের সর্পিল ডাক

শঙ্খমন্দ্র। দিগন্ত ছুঁয়ে সংশয় হয় প্রত্যয়বান :
বাল্মবতীরেখা কি ?
মানে না হৃদয় : বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
সমুদ্রময় যুদ্ধজীবনে শান্তি-এষণা রুদ্ধঅশ্রু
অলীকস্পর্শী। ঘন-কালো মেঘে কাজলের টানা
বজ্রের দূত তাড়িৎবাহিনী।
পুষ্পবিলাসী বসন্ত তাই হয়েছে গল্প এবং নীলিমা
ময়ূরকণ্ঠী তুচ্ছ কাহিনী।
মেঘফেননিভ শয়ন হয়েছে পঙ্কশয্যা।
রক্তের নীড়ে লালিত আবেগ মোহের লজ্জা।
কুহুস্বর শুনে চমকে ভাবছি : হায় দুর্মর কেকা কি ?
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩)

ত্রিকালজ্ঞ

আমরা দু'জন দু'দিক থেকে আমাদের পিতাকে
তর্জমা করে দিচ্ছি অন্য ভাষার কবিতা

আমাদের পিতার বয়স বাড়ছে, যেমন সচরাচর সবারই বয়স হতে থাকে
আমাদের দু'জনেরও বয়স বাড়ছে, অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতার আলোয় আমাদের দু'জনের তর্জমা
দু'রকম হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের
ত্রিকালজ্ঞ পিতার অভিজ্ঞতা আরো
তিনি কোনো ভাষ্যই উড়িয়ে দিচ্ছেন না
সম্পূর্ণ তৃতীয় পাঠ তৈরী করে নিচ্ছেন
মূল রচনার কাছাকাছি।

তাইরেসিয়াস

দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে
আনন্দ পেয়েছে কিনা বলেনি, তবুও
দেবী তাকে অন্ধ করে দিয়ে
আনন্দ পেয়েছিলেন, তার জননীর আর্তি শুনে শেষে,
নিজস্ব গহন ঝাঁপি থেকে নাগশিশুটিরে ডেকে
নির্দেশ জানান :
'তাইরেসিয়াসের কান জিভ দিয়ে চেটে দে, তাহলে
বুঝতে পারবে যতো ভবিষ্যকথক দৈববাণীরত
পাখির সংলাপ !'

ফলত যেমন অন্ধ তেমনি অন্ধ রইল, সন্ন্যাস
চায়নি, সন্ন্যাসী তবু রয়ে গেল তাইরেসিয়াস।

তাছাড়া মিথুনমগ্ন দেখেছিল পাহাড়চূড়ায়
দুটো সাপ, রমণের বদলে হঠাৎ আক্রমণ
করল তাকে সাপদুটো, সে তখন
লাঠি দিয়ে আঘাত করতেই
নাগিনীর মৃত্যু হলো। সেই শাপে তাইরেসিয়াস
নারী হলো, বেশ্যার জগতে
তার খুব নাম হলো। ঠিক তার সাত বছর পর
দেখল সে একই ঘটনা, পুরুষ-সাপটাকে
হত্যা করতেই অভিশাপে
বনে গেল নিতান্ত পুরুষ।

তার যেন দায়িত্ব সব দেখেও না-দেখার ভান করা—
সেটা সে করেনি, তাই অভিশপ্ত তাইরেসিয়াস।

তিনটি নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায়
একটিকে বলল সুন্দরী,
আফ্রোদিতে তৎক্ষণাৎ জরতী বানিয়ে দিল তাকে।
নির্বাচিত মেয়েটি যদিও
কৃতজ্ঞ দু'হাতে তাকে দিয়েছিল উপহার
একরাশ কোঁকড়ানো চুলের বাহার
কী করবে তাইরেসিয়াস একমাথা চুল নিয়ে, তার
ভাঁড়ার যখন শূন্য ?

দুষ্পিতা জিউস আর হেরা-র ভিতরে
দ্বৈরথ বাধল :
শৃঙ্গারমুহূর্তে
নারী না পুরুষ কার বেশি সুখ ?
নিষ্পত্তি করার জন্য ডাক পড়ল তাইরেসিয়াসের
ওর নাকি এই মর্মে খুব অভিজ্ঞতা।
যদিও আমরা জানি এ বিষয়ে তার
অনভিজ্ঞতার শেষ নেই, তবু কী করবে বেচারা
তার এই নিয়তি তাকে বিচারক হতে হবে, আর
নিজস্ব বিবেকমতো রায় দিলেই ঘটবে লাঞ্ছনা।
তাইরেসিয়াস খুব অঙ্ক কষে রায় দিল শেষে :
'শৃঙ্গারশিহর যদি দশ হয় নারীর আনন্দ
তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে বাকি শুধু থাকে এক,
সেইটেই পুরুষের আনন্দ।'
—জিউসের বিজয়ী মুখ দেখে হেরা এমনই চটলেন
যে ওকে দ্বিগুণ অন্ধ করে তবে তিনি
আনন্দ পেয়েছিলেন শোনা যায় ; সর্বজয়ী দেবতা জিউস
তাঁকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা
ছিল না হেরা-র, তাই মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি
তাইরেসিয়াসকেই একহাত দেখে নিলেন, তাই নাকি ন্যায়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জিউস অবিশ্যি ততো অকৃতজ্ঞ ছোটলোক নন,
তিনি তাকে দিব্যদৃষ্টি আর সাত জননের আয়ু
দিয়েছেন বটে, তবু তাইরেসিয়াস
কী করবে দিব্যদৃষ্টি নিয়ে
যা শুধুই অমাবস্যা দেখায় ? তাছাড়া
জন্ম নিতে জন্ম দিতে যাবে কেন সন্ন্যাসী, যখন
পারবে না শিশুকে তার বৈতনিক পাঠশালায় দিতে ?

দ্রষ্টার ভূমিকা ভালো, বলি তাকে, আর দ্রষ্টাকেও
মাঝে মাঝে চরিত্রে নামতে হয়, দক্ষিণ ভারতে
এখনো মিথুনরত সাপ দেখলে দুর্ভাগ্য ঘনায় ;
বলেছি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অংশ তুলে :
'তুমিই পুরুষ, তুমি নারী, তুমি যুবন্ এবং
সুকুমারী ; আচম্বিতে নড়্বড়ে লাঠিতে ভার রেখে
জীর্ণ তুমি বৃদ্ধ তুমি ঝুঁকে পড়ো তারপরে সহসা
নীল পাখি, সবুজ, হে লোহিতাক্ষ তা-ও তুমি'—তবে কি তোমারও
পরিণামে স্পষ্ট কোনো মুক্তি নেই ?

সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের প্রাঙ্গণে শামিয়ানার নিচে
'আন্তিগোনে' অভিনয় শেষ হলে এইসব কথা
জানাতেই আমাকে তার ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী দু'ডানা
ছুঁইয়ে অথর্ব করে রেখে গেছে তাইরেসিয়াস ।।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩)

এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত নক্ষত্র আজ খেলা করে আকাশের বুকে
আমি যেন টের পাই
আমি যেন দেখে যেতে পারি
তোমাদের কঠিন অসুখে
তোমরা ঔষধপত্র পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক
অনন্ত নক্ষত্র দূরে খেলা করে—করে হতবাক্ !

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়—ঐ নক্ষত্রেরা
আমরা তো পৃথিবীর লোক
আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগদ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
অনন্ত নক্ষত্র তবু খেলা করে—দূরে যায় দেখা ।

ওদের সমুদ্র ওরা জানে কিনা
ভুল হয় কেবলি ঠিকানা
ওরাও কি লেখাপড়া জানে ?
মিছে কানে-কানে
কথা বলে—ওদের সকলে
আমরা কি ইস্কুলের কলে
জল খাই—করি না টিফিন ?
নক্ষত্র—জেনেছে ছাই—পড়ে আছে গাঁথা সেফটিপিন !

দূরে-দূরে
আকাশের বুক খুঁড়ে-খুঁড়ে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নক্ষত্র কোদাল হাতে চলে গেছে কে জানে কোথায়
কবে কোন্‌কালে দেখা যায়
ওদের রাজ্যের সব লোক ?
আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগদ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
নক্ষত্রের চেয়ে কিছু বাকি আছে মানুষের শেখা ?

মানুষ তোমারি বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্ফিউস
তুমি জেনে গেলে সব
তোমাব মৃত্যুর পর আমাদের ফুলে-ভরা টব
লুণ্ঠনের দাগ মেখে আজো তো ছাদেই পড়ে আছে
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে
ভালোবাসা ছিল খুব কাছে ।

তুমি নীলকণ্ঠ চারা পুঁতে দিয়ে বলেছিলে—'একে জল দাও
একে আর বিষণ্ণ রেখো না
আমার মতন এ-ও খুঁজেছে বিছানা ।'

'ভালোবাসে
কুকুরের মতো
একে তুমি দিয়ো না নিষ্ফল
ধুলোবালি'

বাংলাদেশে
তোমার মৃত্যুর পরে এসে
লাভ হলো—'সতর্কীকরণ !'
কত সুধা দেখেছিলো মন
কত বিষ চেখেছিলো মন

তা সবই অম্লান
যতই বিদেশ থেকে আনো
স্বাধীনতা বোধ কী তা আমি জানি—তুমি যত জানো !

তুমি আছো দূর-পরপারে
সেখানে কখন ট্রেন ছাড়ে ?
আছে টেলিফোন ?
তোমাদের বাজার কেমন
তোমাদের দোকান কেমন—
রাজধানী ?
কাছা দেয় মদের দোকানী ?

তোমারো প্রকৃতি নয় নক্ষত্রের কাছে ধার করা
যে বাঁশি বাজাও তুমি
তাকে আরো মূল্যবান করা
হবে কি আমার ?
প্রিয় অর্ফিউস, আমার স্তবেই হলো হার ।।

মন্ত্রের মতন আছি স্থির

যে কাঁদে সে কাঁদে, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির
ধ্রুবের মতন আছি, আগামীর সম্ভাবনাময়
প্রেমের মতন আছি পিছুপিছু, পশ্চাদ্ধাবিত
মায়ার মতন আছি, ছায়া নয়, সাংকেতিক নয়
মোহ হয়ে আছি, আছি মেঘ হয়ে মাথার উপরে
কখনো ঝরবো না ভেবে, নিরঙ্কুশ বৃষ্টি হয়ে আছি

কাঁথার উপরে আছি ছুঁচ হয়ে, খরমুজের ফালি
হয়ে আছি বোধময় কবিতার পঙ্‌ক্তির মতন·····

যে কাঁদে কাঁদুক, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির।

বৃদ্ধ হয়ে আছি সেই যুবতীর কাছে
যে আমাকে বলেছিলো, এখনি হাসাও
হাসি আমি ভালোবাসি, সর্দি ভালোবাসি
ভালোবাসি মুখচোখ নৈকট্য প্রধান
প্রেম, দেহতত্ত্ব আর কোলের সন্তান···
বৃদ্ধ হয়ে আছি সেই যুবতীর কাছে

যে কাঁদে কাঁদুক, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির।

কমলালেবুর মতো হয়ে আছি রোগীর শিয়রে
আরোগ্যের কথা ভেবে, পরিত্রাণময় যন্ত্রণার
কথা ভেবে কমলার মতো হ'য়ে রোগীর শিয়রে
আছি দীর্ঘকাল ক্ষুব্ধ ডাক্তারের মতো
বৃদ্ধ হয়ে আছি ঐ ডাক্তারের মতো
যুবতীর কাছে আছি ডাক্তারের মতো
—যে কাঁদে কাঁদুক, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির।
জীবন নিঃশব্দ হয়ে শুয়েছিল পাতার আড়ালে
শামুক যেভাবে শুয়ে থাকে কোনো আড়ালে পাতার
জোঁকের মতন খিন্ন, চঞ্চল এবং শব্দহীন
কণ্ঠস্বর বলে কিছু নেই বলে কথাও বলে না।
শুধু একা একা চলে নিরুদ্দেশে, ভেসে চলে একা
কিছুই দেখার নেই চোখ মেলে, হৃদয়ের দেখা
সকল দ্রষ্টব্য, এই কথা জেনে কথার আড়ালে
শুয়ে আছে গুটিসুটি মেরে এক শামুকের মতো

পাতার আড়ালে শুয়ে আছে বোবা শামুকের মতো
মুখে বুকে যেন কোনো ভাষা নেই, ভাষান্তর নেই
শুয়ে আছে, শুয়ে আছে যেন শুয়ে থাকাটাই
মহত্তম কাজ জীবনের।

ভাষার ভিতরে খুবই অভিমান আছে
অভিমান কার নেই ? ধুলোবালি—তারও বুক ঠাসা
অভিমান, মনে হয়, নিয়ে যাবে মৃত্যুর কৌটায়
পুরে, কোনো মূল্যবান পাথরের মতো সযতনে
ভাষার ভিতরে খুবই অভিমান আছে
এই অভিমান নিয়ে সংবাদপত্রের দম্ভ খুবই
স্তম্ভের মতন সেই দম্ভ দেখে আত্মঘাতী যুবা
মনে মনে স্থির করে, সময়ের বিবেচনা করে—
নিজের দুহাতে নিজ কণ্ঠ চেপে সহসা বিদায়
নেয়, কিংবা কোনোভাবে নিজেকে সংশয়মুক্ত করে :
বিদায় প্রত্যন্তভূমি, বিদায় সন্ন্যাস, ঘরে ফেরা
বিদায় বন্ধুর মতো চেনাগলি, সবুজ, বিদায়
স্নান ঘর ছিলো এই অঙ্কুশ প্রধান জীবনের
একমাত্র খেলাঘর, খেলা ছিল, ভালোবাসা ছিল।

এখন সময় নেই, খেলা গেছে, ভালবাসা গেছে।
এখন সমস্ত কিছু আশ্রয়ের তদারকি দিয়ে ঘেরা
ঘরে ফেরা কেন কষ্টকর, তা কখনো স্পষ্ট নয়, তবু
ঘরে ফেরা কষ্টকর হলো—দিন দিন পাতার আড়ালে
নিজেকেও নষ্ট করি, বাক্‌হীন করি
অভিমান থেকে শুধু বের হয় শিকড়ের মতো
অপমান বোধ আর নষ্ট হয় যা ছিলো জাগ্রত
আলোর মতন সুষ্ঠু, আরোগ্যের মত ধ্বনিময়

মেঘ, যাতে বৃষ্টি হয়, সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি হতে থাকে
সে সকলি নষ্ট হয় গ্লানিময় অপরাধ বোধে
পাতার আড়ালে শুধু শামুকের খোসা
ভিতরে পদার্থ নেই, জীবনের সমস্তই জ্বালা।

জীবনের উপরে ক্রোধ নিজেই জানিনা
সে কারণে কষ্ট বেশি, নষ্ট হতে কষ্ট বেশি লাগে
আকাশ-বাতাস সবই কষ্ট দেয়, অভ্যর্থনা নয়
স্বাগত জানায় দূর শ্মশানের ধোঁয়া
ক্রমশ পোড়ার গন্ধ, বাল্যকাল যৌবনের কিছু
দিনরাত, গঙ্গানদী, মন্ত্রপাঠ, চেলাকাঠ আর
পরম কর্তব্যরত সন্তানের মুখ…
কষ্ট, যা ওদেরি জন্যে, নষ্ট হয়ে গেলে
কষ্ট, যা ওদেরি জন্যে…বড়ো অভিমান।।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৬৪)

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে
গুজরাটের বন্যা দেখতে যেও না
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
ক্রুদ্ধ জলের প্রবল তোলপাড়ে উপড়ে গেছে রেললাইন
চৌচির হয়েছে ব্রিজ, মৃত পশুর পেটের কাছে ছন্নছাড়া বালক

তরঙ্গে ভেসে যায় বৃদ্ধের চশমা, বৃক্ষের শিখরে মানুষের
আপৎকালীন বন্ধুত্ব
এই সব টুকরো দৃশ্য—এক ধরনের সত্য, আংশিক, কিন্তু বড় তীব্র
বিপর্যয়ের সময় এই সব আংশিক সত্যই প্রধান হয়ে ওঠে
ইন্দিরা, লক্ষ্মীমেয়ে, তোমার একথা ভোলা উচিত নয়
মেঘের প্রাসাদে বসে তোমার করুণ কণ্ঠস্বরেও
কোনো সার্বজনীন দুঃখ ধ্বনিত হবে না
তোমার শুকনো ঠোঁট, কতদিন সেখানে চুম্বনের দাগ পড়েনি,
চোখের নিচে গভীর কালো ক্লান্তি, ব্যর্থ প্রেমিকার মতো চিবুকের রেখা
কিন্তু তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো এই পথ
তোমার আর ফেরার পথ নেই
প্রিয়দর্শিনী, তুমি এখন বিমানের জানলায় বসে
উড়ে এসো না জলপাইগুড়ি, আসামের আকাশে
এ বড় ভয়ংকর খেলা
আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি—
উঁচু থেকে তুমি দেখতে পাও মাইল মাইল শূন্যতা
প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়মহীনতার সর্বনাশা মহিমা
নতুন জলের প্রবাহ, তেজী স্রোত—যেন মেঘলা আকাশ উল্টো
হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবীতে
মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন বাড়ি, কাণ্ডহীন গাছের পল্লবিত মাথা
ইন্দিরা, তখন সেই বন্যার দৃশ্য দেখেও একদিন তোমার মুখ ফস্কে
বেরিয়ে যেতে পারে, বাঃ কি সুন্দর !

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

শব্দ মোহ বন্ধনে কবে প্রথম ধরা পড়েছিলুম আজ মনে নেই
কোনো এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের পাশে
অকস্মাৎ দেখা যেন ঠিক আর এক স্রোত
সমস্ত ধ্বনির পাশাপাশি অন্য এক ধ্বনি
জীবন যাপনের পাশাপাশি এক অদেখা জীবন যাপন...
এক একদিন মনে হয়, প্রত্যেক পথেরই বুকের মধ্যে রয়েছে
দিক-হারাবার ব্যাকুলতা
চেনা বাড়ির রাস্তা দুঃখে কাতরায় নিরুদ্দেশের জন্য
প্রত্যেক স্বপ্নের ভিতরে আর একটি স্বপ্ন, তার ভিতরে, তার
ভিতরে, তার ভিতরে...

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বাল্যকাল ছেড়ে একদিন এসেছি কৈশোরে
বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট ছোট স্টিমারের মত ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে
ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক
তার সঙ্গে মিশে গেল হেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস...

তারপর
একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন,
আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর
তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি..

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
ছেলে ভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙীন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
সারবন্দী জাহাজ
ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেণ্ডারের ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দীঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দু' মাসে একবার মামা-বাড়ীতে বেড়াতে যাবার উৎসব...
ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশী রাতে দেখা অজস্র ফুটপাতের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
প্রাণ খোলা বুক কাঁপানো হাসি

চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন
দশকর্ম ভাণ্ডারের পাশে গাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না
কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
স্তন্য দেয় সেখানে
এই সব দেখে, শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
এক জোড়া বিসদৃশ ঠ্যাঙ
গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে
ছিপি খেলছিলাম...

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর সুদূর শহর
গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে
জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভাবে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চাইনি
এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া
শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থলপদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিঁপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কাচ অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা

অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
নাকিস্থর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
অথবা জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে
আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধ লেবুর বাগানে শিশির পাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দীঘির জলে একা একা চাঁদের
অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলায়
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে একদিন সব নৈঃশব্দ্য খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে
জেগে উঠতো নিশির ডাক :
সন্তা না মলে ? সন্তা না মলে...

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশ গঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালী পীরিচ
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যে-রকম জলস্তম্ভ ভাঙে

কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সুর্কি ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে
যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জ্বলছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল সেখানে কান্নাব শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশী
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ...
আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
মাথা তুলেছি আকাশের দিকে
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন সমতল
আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়
আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকড়, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর !
আমরা ধূসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ

আমরা ঠনঠনের রাস্তায় হাঁটু-সমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুল চোর
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত, বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত
ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুংকার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল উত্থান।

যারা অপমান দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেছে পথের বাঁকে, তারা
হয়তো ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি
স্মৃতির মধ্যে ঢুকেছিল বীজ, একদিন তা মহীরুহ হয়েছে
সমস্ত গভীরতার চেয়ে গভীর পাতালতম প্রদেশে তার শিকড়
সমস্ত উচ্চতার চেয়ে উঁচুতে অভ্রংলিহ তার শিখর
তার হিরণ্য ডালপালায় বসেছে এক পাখি যার হীরে কুচি চোখ
বহুদিনের অতীত ভেদ করে সে বলেছে, প্রতীক্ষায় আছি
আমার সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগে, কার জন্য প্রতীক্ষা?
কিসের জন্য প্রতীক্ষা?
আমি বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকাই, আকাশকে মনে হয়
বারুদখানা
আমি বৃষ্টির মধ্যে সরু হয়ে হেঁটে যাই, বৃষ্টিকে মনে হয়
তেজস্ক্রিয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি জানলার গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার প্রাণ-প্রতিমাকে
প্রশ্ন করি, জানো, কার জন্য প্রতীক্ষা ?
কিসের প্রতীক্ষা ?
এ তো প্রতিশোধ নয়, প্রতিশোধের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক মনোরাজ্য
যার কামারশালায় বিচ্ছুরিত শব্দের ফুলকি সর্বক্ষণ
ঘিরে রাখে আমার
একলা সময়
আসলে আমার একাকিত্ব নেই, আমার নির্জনতা নেই, মুক্তি নেই
এক একদিন এই শহর স্তব্ধ হয়ে যায়
এক একদিন এই চোখে দেখা জগতে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়
সমস্ত জনপ্রাণী
সেই মাতৃ গর্ভের মতন নিবাত নিষ্কম্প অস্তিত্বের মধ্যেও
জেগে থাকে আদিম শব্দ
সমস্ত জাগরণের পাশে সেই এক মহাজাগরণ
সমস্ত ধ্বনির চেয়ে সেই এক আলাদা ধ্বনি
তখন সমস্ত অন্ধকারের পাশে এসে দাঁড়ায়
এক অন্য অন্ধকার
স্পষ্ট চেনা যায় এক একবার, আবার চেনা যায় না
গভীর অতলের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে যেতে হঠাৎ আঁকড়ে ধরি
ভাসমান তৃণ
এই নিমজ্জন ও ভেসে ওঠা, বারবার, যেন শরীরের মধ্যেই
শরীরকে খোঁজাখুঁজি
যেমন নারীর ভিতরে নারীকে, তার ভিতরে এক অন্য নারী, যেমন
স্তন ও কোমড়ের খাঁজে অন্য এক
রূপের চোখ ফাটানো বিভা,
তার ভিতরে অন্য এক, তার
ভিতরে, তার ভিতরে,
যেমন স্বপ্নের মধ্যে
স্বপ্ন...

এমনকি যেখানে সুন্দর অতি প্রথাসিদ্ধ, অরণ্যে বা পাহাড় চূড়ায়
যেখানে মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় মেতে থাকে মেঘ ও রৌদ্রের প্রভুরা
সেখানে সমস্ত আলোর পাশে উড়তে থাকে আরও একটি আলোর পর্দা
সমস্ত বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আসে আর একটি বৃক্ষ, তার
হিরণ্য ডালপালা নিয়ে
সেখানে বসে থাকে একটি পাখি, যার হীরে কুচি চোখ
অচেনাতম কণ্ঠস্বরে সে বলে ওঠে, মনে আছে? প্রতীক্ষায় আছি!
তখনই শৃঙ্খলের মতন ঝনঝনিয়ে ওঠে নাদব্রহ্ম, তখনই
ছ' নম্বরের দিকে ব্যাকুলভাবে চায় পাঁচটি ইন্দ্রিয়
কার প্রতীক্ষা? কিসের জন্য প্রতীক্ষা? উত্তর পাইনা
যদিও জানি, এই নীলিমার পরপারে নেই আর অন্য নীলিমা
মৃত্যুর ওপারে জীবন!
ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ছায়া, সমান দূরত্ব রেখে
যমজের মত ছুটে যায়
অথবা হ্রদের পাশে খুব শান্তভাবে বসে থাকা, যেন দু'রকম জলের কিনারে
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়, দেখা হলো, দেখা হলো
রোদ্দুরের মধ্যে ওড়ে কার্পাস তুলোর বীজ,
এত মায়া, এত বেশী মায়া
পায়ে পায়ে চোর কাঁটার মত ভুল, ফেলে যাওয়া নীল রুমালের মত
অভিমান
সব কিছু এক জীবনের নর্ম সহচর, দেখা হলো, আরক্ত সন্ধ্যায়
দেখা হলো
দেখা হলো নারী ও নৈরাজ্য, কয়েক ফোঁটা ছন্নছাড়া কান্না বিন্দু
পড়ে রইলো ঘাসে
এদিকে ওদিকে জাগে আকস্মিক হাতছানি, যে-কোনো নদীর বাঁকে
চোখের ইশারা
দেখা হলো, পাথরের বুকে ঘুম, নদীর দর্পণে লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে
দেখা হলো
জননী-চুম্বক ছেড়ে আরও দূরে দেখা হলো নিভৃত শিল্পের বড়
মর্মভেদী টান
দেখা হলো, দেখা হলো, দেখা হলো...

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫)

সরল প্রাণী

[মানুষের মতো এমন সরল প্রাণী আর নেই।
সেই প্রথম বিশ্বাস করেছে ঈশ্বর আছেন।
হাজার মন্দির ঘুরে এসেও একটু জাগালেই সে এখনও
যুদ্ধে চলে যায়, রক্তের শ্রাবণে মাতে।
বুদ্ধ মানুষকে বুঝিয়েছিলেন—তারা বুঝেছিল,
যীশু মানুষকে শোনালেন—তারা চুপচাপ শুনল,
হিটলার হাতে অন্যায্য আয়ুধ, পাপী পরমাণু
তুলে দিলেন—প্রতিবিম্ব মানুষকেই মারল।
তারপর একদিন হাসি-হাসি মুখে রাষ্ট্রসঙ্ঘে
দেশের বাঁধানো নাম সামনে নিয়ে গদিতে বসল মানুষ,
কিন্তু এক গ্লাস জল খেতে-না-খেতেই শুনল,
ভাই ভাইকে মারছে, সঙ্ঘ বললেন, "দেখছি"। শকুনক্রান্তিতে
ভরে গেল বৈদূর্য আকাশ—সঙ্ঘ বললেন, "দেখেছি"।
আমি দার্শনিক বিশ্ববাবুকে জিজ্ঞেস করলাম,
তিনি বললেন, "তাইতো……।"]

যান গঙ্গাতীরে দেখবেন অজস্র ভালবাসার ভিড়ে ভরে আছে তীর!
ছোট সংস্করণ সরোবরে যান দেখবেন বেঞ্চবুড়োদের সামনে
হাতে হাত দিয়ে নিঃশঙ্ক হাঁটছে টাটকা যুবা ও উন্মুক্ত নাভির সাহসিকা!
এরই মধ্যে কেউ নক্ষত্রে তাকাচ্ছে, কেউ বলছে এবার বৃষ্টির পরে
ময়দান বড় সবুজ; কেউ বা বিস্মিত—মাটির এক জায়গায় শিকড়ের মতো
স্থির দাঁড়িয়ে ভাবছে, "এখানে নিশ্চয় কোনো গাছ ছিল।"
পার্কে, রেস্তোরাঁয়, শহরের যে-কোনও আঁধারে সুযোগ পেলেই
দম্পতি হয়ে উঠছে শরীর। ডেটলের গন্ধ, রাবারগ্লাভস্ খোলার শব্দ এসে

কেবলই আক্রমণ করছে বাবু কবিতাকে
অক্ষরগুলি সাদা শীর্ণ হতে-হতে বেরিয়ে পড়ছে কঙ্কাল
তারা মানুষের দরজা-জানালা আক্রমণ করছে,
বাথরুমের কল থেকে আর জল পড়ছে না
সময় পালাচ্ছে তবু ক্যালেণ্ডারের পাতা ছেঁড়া হয় নি, কারণ
মানুষের মতো এমন সরল প্রাণী আর নেই,
সে এখনও বিশ্বাসপ্রবণ, এখনও সে পেঁপে ও শসা, নিটোল বেগুন
কিনে আনে বৌ-এর জন্য। বিপ্লবীর স্ত্রী করে লক্ষ্মী পূজা;
মন্ত্রীর পরিবার রবিবার হাত দেখায় হরিশ আচার্যকে!
মানুষ ভাগ্যের হাতে থাপ্পড় খায়, কদাচিৎ বিরল চুম্বনও,
তারপর শেষবার বৃক্ষের শুকনো হাড়ে আগুন জ্বালিয়ে
সৎ বোকার মতন নিজেকে পোড়ায় সরল মানুষ।

বিনয় মজুমদার (১৯৩৫)

আমি আর করবী কুসুম

কার্য সমাপন হলে ছায়ার মতন এসে ছায়া দেয় সাবলীল ঘুম;
পরস্পর আলিঙ্গনে শুয়ে থাকি আমি আর করবী কুসুম।
আকাশের পরিসরে আলো আর অন্ধকার নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে,
সকল তারার আলো পরস্পর মেলামেশা করে
প্রেমার্ত চিন্তার মতো, পবিত্র চিন্তার মতো হয়ে।
কার্য সমাপন হলে ছায়ার মতন হয়ে ছায়া দেয় সাবলীল ঘুম;
প স্পর বাহুপাশে শুয়ে আছি আমি আর করবী কুসুম।
চিন্তার সঙ্কট এলে এইরূপ কথা ভাবা, দৃশ্য ভাবা, নিরাপদ, ভালো।
তবেই আদর করে ভালোবাসে সময় আকাশ অগ্নি নক্ষত্রের আলো।

অমিতাভ দাশগুপ্ত (১৯৩৫)

কাঠের চেয়ার

কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে
মানুষও একদিন কাঠ হয়ে যায়।
তার পায়ের আঙুলগুলো
শিকড় হয়ে চারিয়ে যায় মেঝের ভেতর।
তার কোমর থেকে
সোঁদরি, গরান, গঁদের আঠা ঝরতে ঝরতে
একদিন তাকে পুরোপুরি এঁটে ধরে তক্তার সঙ্গে।
কুরকুর……কুরকুর
ঘুণপোকা ঘুরতে থাকে তার আশিরনখর,
কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে
একদিন পুরোপুরি কাঠ হয়ে যায় সে।

তখন
কেউ তাকে চড় মেরে চলে যায়।
সে রাগে না।
সমর্পণ নিয়ে নারী এসে কাছে দাঁড়ায়।
সে কেঁপে ওঠে না।
টালমাটাল পায়ে শিশু ছুটে আসে।
সে দু'হাত বাড়িয়ে দেয় না।
একটার পর একটা কাঠ জুড়তে জুড়তে
সে এমন এক কাঠের চেয়ার এখন,
যার শরীরের সন্ধিতে সন্ধিতে শুধু
জং-ধরা পেরেকের গান
ঘুরঘুর ঘুণপোকার গান
একটানা করাত-চেরাইয়ের গান।

যে-হাত একদিন সমুদ্র শাসন করত
তা এখন চেয়ারের দুই ভারী হাতল।
যার দুই উরুতে একদিন
টগবগ করত একজোড়া বাদামী ঘোড়া
আজ তার ডান পা কেটে নিলে
বাঁ পা জানতে পারে না।
কাঠের অশ্রু নেই, স্বপ্ন নেই, নিদ্রা নেই, হাহাকার নেই,
একটু কষ্ট করলেই
জানালায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেত
ঢ্যাঙা কালো বেঁটে মাঝারি
উটের মতো পরিশ্রমী
মানুষ মানুষ আর মানুষ।
কিন্তু কাঠের চেয়ারের এই হ'ল মুশকিল
সে জানলা-অব্দি হেঁটে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

শুধু
কাঠের ভেতর লোহার পেরেক-আঁটা
তার দুটো চোখ
বাকি জীবনভর
ছোট চেয়ার থেকে মেজ চেয়ার
মেজ চেয়ার থেকে বড় চেয়ার হওয়ার
স্বপ্ন দেখতে থাকে॥

আল মাহমুদ (১৯৩৬)

অভুক্ত স্বপ্ন থেকে ফিরে আসা

কাল আমি এক দুঃস্বপ্নের উপত্যকা পার হয়ে এসেছি। প্রথম মনে হয়েছিল
আমি কোনো উপত্যকাভূমির ঘন ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু হাঁটা পথের
চারপাশে ইতস্ততঃ ইট আর কোনো প্রাসাদোপম অট্টালিকার
ধ্বংসাবশেষ দেখে, আমার ভুল ভাঙলো।
আমি দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকালাম। মনে হলো,
এক অভিশপ্ত নগরীর নির্জন রাজপথে আমি দাঁড়িয়ে আছি।
আমার ভয় হলো, অথচ মনে হলো বড়ো চেনা।
কে আমাকে এখানে আনলো ? তবে কি আমি ভুল করে
রাতের অন্ধকারে অবলুপ্ত নগরী মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তরে চলে এসেছি ?
ঝিঁঝিঁর চিৎকারে আমার কান ঝালাপালা,
ভয় আর শীতে আমি কাঁপছি। জোনাক পোকার আলো
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মত আমার চুল, আমার মুখ, আর বুকের ওপর
স্পর্শ রাখছে।

আমি দৌড় মেরে পালাতে চাইলাম। আমার পা সরলো না।
আমার সামনে কবরের মত যে জায়গাটা ছিল,
সেখান থেকে ধমকের মত একটা শব্দ এসে আমাকে থামিয়ে দিল।
আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত কবরের দিকে এগোলাম।
যখন কবরের পাশে দাঁড়ালাম,
কবর আর কবর রইল না।
পৃথিবীর পেটের ভেতর সিঁড়ির মত একটা পথ দেখতে পেলাম।
কে যেন আমাকে বললো, 'যাও'।
আমি আশেপাশে তাকালাম, না, কাউকে দেখছি না।
আবার নির্দেশ হলো, 'যাও'।

ভয়ে আমি সিঁড়িতে পা দিলাম। আমার হৃদপিণ্ড দুলছিল।
অন্ধকারে আমার চোখ অন্ধ। তবু আমি প্রতিটি ধাপ পেয়ে যাচ্ছি,
পেরিয়ে যাচ্ছি।
আমি যখন থামলাম, তখন আর অন্ধকার ছিল না।
এক ধরনের আবছা আলোর মধ্যে এসে পড়েছি।
কেউ থামতে বলেনি, আমার মন বললো এখানে থামা উচিত।

আমার সামনে এক প্রাসাদ দেখলাম। মনে হলো, পুন্ড্রবর্ধনের
প্রাচীন কোনো রাজবাড়ীর সিংহদরোজায় আমি দাঁড়িয়ে।
আমার কেন জানি মনে হলো, সূর্য ওঠার আগেই আমাকে
প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে, না হলে উপায় নেই।
আমি ভেতরে প্রবেশ করে দুয়ার ভেজিয়ে দিলাম।
দামী কার্পেটে পা ডুবিয়ে আমি ঘরের আসবাবপত্র দেখতে লাগলাম।
দারুশিল্পের এক অতীত জগতে এসে পড়েছি। আমার চারিদিকে
মেহগনির আসনের ওপর রেশমের গদী। দেয়ালের একটি বিশাল তৈলচিত্রে
নগরনটী কমলা অভয়মুদ্রায় নৃত্যপরা। দেয়ালের অন্য পাশে
হরিণের চারটি মাথা। মৃত হরিণেরা তাদের চারজোড়া পোখরাজের হলুদ
চোখে
আমাকে দেখছে।

ভাবলাম, এ প্রাসাদ কার? আর অমনি ভেতরে একজোড়া কপাট
আস্তে খুলে গেলো।
আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রাসাদের রাজা আর রাণী।
রাজার হাতে যে চাবুকটা আছে
তা আমার কানের কাছে শব্দ করে উঠতেই, আমি
ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। কিন্তু রাণীমা মহারাজের হাত চেপে ধরে বললেন,
মেরো না, কে ও?
আমি বললাম, মা আমি হত্যার অভিযোগে বন্দীদের একজন,
আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। আর কোনোদিন আসবো না।
বিকট হাসিতে রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠলো। মহাসামন্তমহারাজাধিরাজ
হাসতে লাগলেন! মেহগনির তাকের ওপর কালো বুদ্ধমূর্তিটি

আরও কালো হয়ে গেলো মহারাজের হাসিতে। আমি আবার ভয়ে
কাঁপতে লাগলাম। আর তখুনি মহারাণী আমাকে বাঁচালেন।
বললেন, আমার পেছনে এসো।
এক চক্রবর্তী রাজার হাসি আর পৈশাচিক চাবুকের হাত থেকে বাঁচার জন্যে
বালক ভৃত্যের মত রাজ্ঞীর ভূমিতে লুটানো আঁচল তুলে ধরে
আমি কম্পিতপদে তার অনুসরণ করলাম।

বহু ঘর পার হয়ে এক উজ্জ্বল কামরায় আমাকে থামতে বলা হলে,
আমি চোখ তুলে দেখলাম, চারটি স্বর্ণময় সিংহ-আসনে
চারজন রাজকন্যা কথোপকথনে রত।
চারজনের চার বাহারের শাড়ি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।
কেউ পরেছে জামদানী, কেউ কণকের কাজকরা মসলিন।
কারো হাল্কা আবুয়ানের স্বচ্ছতা পার হয়ে দেহলতা দেখা যাচ্ছে।
আবার কারো গাঢ় লাল নয়নসুক শাড়ির পাড়ে
শাদা আগুনের মত রূপোর চুমকি জ্বলছে।
কুমারীরা তাদের বুকের ওপর দিয়ে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে দিয়েছে।
যেন চার রকম অগ্নিশিখার ওপর
ঝাঁপিয়ে পড়েছে চারটি কালো সাপ।
আমি হতবাক হয়ে রাণীমার দিকে তাকালাম।
তিনি অভিভাবিকার মত আমার দিকে ফিরে বললেন,
এখান থেকে তোমার সঙ্গিনী বেছে নাও।
আমার মনে হলো, তার নির্দেশ মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু আমি
কাকে পছন্দ করবো?
চারজনই আমার কাছে সমান রূপসী বলে বোধ হলো।
এদের মধ্যে কে অন্যতমা?
আমার চোখ, আমাকে কোনো সাহায্যই করতে পারছে না।
রাণীমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন,
তোমার চোখ, কোনো কাজের নয়। আমি তাড়াতাড়ি বললাম,
মা, আমার অন্য ইন্দ্রিয়ও আছে। দেখুন আমার হাত,

আমি স্পর্শ করতে পারি। এই যে আমার নাক,
আমি আঘ্রাণ নিতে পারি। আর
এ জিহ্বা দিয়ে আমি লেহন করি।
চারটি প্রাণলাবণ্যের স্বাদ নিয়ে আমাকে পছন্দ করতে দিন।

রাণী হেসে আমাকে মেয়েদের কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন।
আমি প্রথম কুমারীর চিবুক স্পর্শ করতেই পুলকে শিহরিত হলাম।
তার ওষ্ঠের পাশে ঘাসফুলের মত একটি রক্তবর্ণ তিল দেখে
আমার ভালো লাগলো।
দ্বিতীয় কুমারীর মাথায় হাত রেখে তার মুখের দিকে তাকালাম,
সুন্দর নাসিকার ওপর মুক্তোর নাকফুল তিলপুষ্পের চেয়েও
অপরূপ মনে হলো। আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।
আমি যখন তৃতীয়ার কাঁধ স্পর্শ করে দাঁড়ালাম, মেয়েটি হাসলো।
তার পানিফলের মত অপরূপ দাঁত আমার ঠোঁটে চুম্বনের ইচ্ছাশক্তির
প্ররোচনা দিল। কিন্তু আমাকে তো চতুর্থজনকেও দেখতে হবে?
আমি শেষ অর্থাৎ প্রান্ততমার হাত ধরে দাঁড়ালে, এই কিশোরী
লজ্জায় নতমুখী হয়ে রইলো। অন্যহাতে তার চিবুক তুলে ধরতেই,
সে চোখ বুজলো।
এই মৃগনয়নার দু'টি গাঙচিল আমার বাসনার সমুদ্রে
উড়াল দিয়ে থাকলো। আমি কাকে নেবো? আমার স্পর্শইন্দ্রিয়ও
আমার সাথে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমি
আমার ঘ্রাণশক্তির কথা ভাবলাম।

এই আমার শেষ পরীক্ষা। আমার আরও ইন্দ্রিয় আছে
কিন্তু আমি কতক্ষণ আর এক মহান রাজ্ঞীকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি?
প্রতিটি নারীকে আঘ্রাণ করার নিমিত্ত আমি প্রথমার কাছে ফিরে এলাম।
আমি তার বুকের কাছে মুখ নামাতেই
সে তার প্রথম বোতাম খুলে দিল। বহুদূরাগত নেবুফুলের গন্ধে
আমার মস্তিষ্ক ভরে যাচ্ছে। হায়, ফুলের গন্ধে

আল মাহমুদ

আমার কি কাজ ?

আমি দ্বিতীয়ার কাছে পৌঁছবার আগেই, সে তার পোশাকের
দু'টি বোতাম খুললো। মৃগনাভির ঝাঁঝালো গন্ধে
আমার শরীর যদিও রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তবুও
আমি কস্তুরী-সুবাসের জন্যে উপত্যকা পার হয়ে আসেনি !
আমি তৃতীয়ার বুকে তিনটি বোতামই খোলা দেখলাম।
দু'টি বর্তুল শঙ্খের মাঝে নাক ডুবিয়ে আমি প্রাণপণ শুঁকতে লাগলাম।
ধূপের গন্ধে চিরকাল আমার দম বন্ধ হয়ে আসে,
যেন আমি কোনো পূজামণ্ডপের অসংখ্য ধূপদানীর ধোঁয়ার আঁধারে
দেবীর মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারপর উন্মত্তের মত আমি চতুর্থ, অর্থাৎ প্রান্তবর্তিনীর কাছে এসে
নতজানু হয়ে বসে পড়লাম। বললাম, বাঁচাও আমাকে, দয়া করো।
নতমুখী রাজকন্যা দু'হাতে তার বুক চেপে ধরলো। আমি
দ্রুত তার কম্পিত হাত সরিয়ে দিলে, সে লজ্জায়
গ্রীবা বাঁকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালো। এই প্রথম
আমি কোনো নারীর মধ্যে লজ্জা দেখলাম।
আর তা আগুনের মত লাল, আর শোণিতের মত সঞ্চরণশীল।
তার দু'টি মাংসের গোলাপ থেকে নুনের হাল্কা গন্ধ আমার
কামনার ওপর দিয়ে বাতাসের মত বইতে লাগলো। যেন আমি
লবণ পর্বতের পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়বো।

সহসা সম্রাজ্ঞীর দিকে ফিরে বললাম, মা
এই আমার মনোনীতা। আমার বাক্যস্ফুরিত হওয়ামাত্র
ভোজবাজির মত রাণী তার অপরা কন্যাদের নিয়ে
দুঃখিতের মত চারটি দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন।
আর আমি আমার মনোনীতার হাত ধরে বললাম,
আমরা কোথায় যাবো ? বধূ বললো, বাসরে।

মেহগনির বিশাল পালংকে আমার বিছানা। আমি নদীর মত

বাঁকে বাঁকে ঘোরানো তার শাড়ির আঁচল
যখন মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছি, ঠিক তখুনি সেই
সর্বনাশা হাসি শুনতে পেলাম। ঠা ঠা শব্দে
রাস্তার সেই পাথর কাঁপানো হাসিতে আমার স্ত্রী
দৌড়ে পালিয়ে গেলো। আর অদৃশ্য চাবুক ছোবল মারল
আমার মস্তকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আর

অজ্ঞান মানেই হলো, অভুক্ত স্বপ্ন থেকে ফিরে আসা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬)

কম্পোজিশন

ব্রিজ উতরোল্লুম। টেম্পোট্রাকবাসআনুষমানুয গলাগলি।
পিঠের পিছু দিয়ে সীমানালাইন পেরিয়ে উড়ে চলেছে সিঁদুরসূর্য,
টকটকে লাল নিঃশব্দ অরফ্যানগঞ্জের গলি।
সবাই নিশ্ছায়া হয়ে চলেছে তুমিও
আস্তে আস্তে চলো প্রেমিকের কাঁধে ভর রেখে।
সবাই নিশ্ছায়া, শুধু রেস্তোরাঁর সুগন্ধে মিলিয়ে
জ্বলে উঠল ফুটন্ত লালের রঙে পোষমানা ল্যা।
তুমিও নিশ্ছায়া ঢোকো ভেসে ওঠো হাতল ঘুরিয়ে।
দু হাত মাথায় শ্লথ কদমে কদমে চলে যাচ্ছে, শুধু জড়তা ভাঙতে
মুঠো আঁট হয়ে ওঠে বন্দুকের বাঁটে, একএকবার।
বর্ষার গুঁড়োর মতো আবছায়া উড়ছে—মাঠ ভর্তি লোক
ঢোকে ভেসে ওঠে লাল পলতের হাতল ঘুরিয়ে—
শুধু একজন, হারাশব্দ বয়ে হাতড়ে ছুটেছে—এই যে আমি—
রথের মেলার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলে
শু ন তে পা চ্ছো ? —একচক্ষু তুরিত স্কুটার
ঝমঝম করোটি বাজিয়ে ছুটে খসে গেল অতল টানেলে…

দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৬)

আর যখন কেউ

আমি এখন অনেক কিছুই বিশ্বাস করি না।
সামনে ব'সে যখন কেউ অহঙ্কারের কথা বলে
আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি
রেসের ঘোড়ার মতো তার লম্বা কান দুটো
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

আর যখন কেউ পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে আমারই প্রশংসায়
আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিই
লোকটার কলমে আর কালি নেই—
যা বলছে তা লিখতে পারবে না।

টেবিলের ওদিকে ব'সে একটা মোটা লোক
সারস সেজে ঝিমোয়—
করমর্দনের জন্যে যখনই সে হাত বাড়ায়
বুঝতে দেরি হয় না
লোকটার পেট জুড়ে শনিবারের বায়ু
ক্রমশ চাপ দিচ্ছে রক্তে—
গম্ভীর না হলেই এখন তার বিপদ!
এখন দরকার দু' চারটে ইয়ারদোস্ত
সদ্য পালিশ-করা জুতোর মতো চকচকে ভাষায়
যারা বলতে পারবে—
'শীতকালেই তো সাজগোজ!'

আর যখন কেউ মৃত্যুর কথা বলে
সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি

আর সতর্ক হবার কিছু নেই—
ঠিক এইখান থেকেই আমাকে এগোতে হবে নির্ভয়ে,
একা।
শুধু খারাপ লাগে যখন
ঘরে ফেরার পর
আমাকে বাঘের গল্প শোনাতে শোনাতে ব্যস্ত একটি শিশু
হঠাৎ ব'লে ওঠে, বড়ো হয়ে একদিন সে বাঘ শিকারে বেরোবে!
আমার অবিশ্বাস থেকে তাকে আমি কিছুই দিতে পারি না।

তাকে কী ক'রে বোঝাবো
বাঘগুলো সবই বস্তুত চিড়িয়াখানায়;
আর ওই যে গায়ের ডোরাকাটা দাগ—
জঙ্গলে ছেড়ে দিলেও ওগুলো থেকে যাবে একইরকম!

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬)

শ্বেত পারাবত

শ্বেত পারাবত, তুমি বড়ো বেশি দেরি ক'রে এলে—
আরো একটু পরে হ'লে আমি ভাবতাম
এই পৃথিবীতে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই:

শুধু ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঈর্ষা, হানাহানি।
গাছ থেকে গাছে শুধু বাদুরের অন্ধ যাতায়াত,
ঝড়ে উপড়ানো ফুলে পোকার গাঁথুনি,
আর সারা দেশ জুড়ে অম্লান শ্মশান।

তবু তুমি এইমাত্র উদ্‌ভাসিত হ'লে—
পেছনের দীর্ঘপথ ঝিনুকের মতো ক্রমে
ছোট হ'য়ে এলো।

শ্বেত পারাবত, তুমি যে আমার কাছে আসতে পেরেছো—
ঢের ধন্যবাদ॥

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩৬)

হাত

কথাটা ঠিক কী, বোঝা যায় না প্রথমটা,
শুধু তীক্ষ্ণ একটা ধ্বনি
ভেঙে দেয় ঘুম-জড়ানো চোখের আড়,
খানিক পরে
দূর-থেকে ছুটে-আসা ঢেউয়ের মতন
বিকৃত ও অনুনাসিক উচ্চারণে
কানে এসে আছড়ে পড়ে
যেন প্রথম দুটি স্বরবর্ণ,
ঢেউ সরে গেলে স্পষ্ট হয়
ছিন্ন ঝিনুকের মতো আরো দুটি সুর-খেলানো অক্ষর··
'দে—বে।'

দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান
সেখানে রয়েছে একটি কলাই-করা থালা
অনিশ্চয় দাক্ষিণ্যের দিকে তুলে ধরা।

কেউ দেয়, কেউ দেয় না।
তবু চলমান এই অক্ষরদুটি
কাঁপতে থাকে সাত-সকালের হাওয়ায়,
পোশাক পালটে নিয়ে তারপর
ঢুকে পড়ে
চারদেয়ালের ভিতরমহলে।

এনামেল-করা অদৃশ্য এক পাত্র হয়ে
ছুঁয়ে থাকে অষ্টপ্রহর
মানুষের দিকে মানুষের বাড়ানো দুটি হাত।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক (১৯২৯)

তিনটে মুখোস-পরা লোক কাল এসেছিল

তিনটে মুখোস-পরা লোক কাল এসেছিল রাসবিহারী থেকে
আমিও মুখোস পরে তাদের সঙ্গেই খুব গল্প করে কাটিয়ে দিলুম।

মুখোসের মুখে ছিল মুখোসের হাসি,
মুখোসের চোখে ছিল মুখোসের চোখ,
মুখোসের কণ্ঠে ছিল মুখোসের ভালোবাসাবাসি,
মুখোসের বুকে ছিল মুখোসের বেদনা ও শোক।

একটা মুখোস বলল, এবারে চা হোক।
একটা মুখোস বলল, কফি।
একটা মুখোস বলল, যামিনী রায়ের ছবি ভালো।
একটা মুখোস বলল, বেঠোফেন, নবম সিম্ফনি।

মুখোসের সঙ্গে কাল কেটে গেল এইভাবে মুখোসের পুরো একদিন।

ফাঁকে ফাঁকে উঁচু পাহাড়ের গল্প, প্রমোশন, বিদেশ-ভ্রমণ,
ফাঁকে ফাঁকে জ্ঞানপীঠ, আকাদেমি, শিক্ষার মাধ্যম।

হঠাৎ চমকে উঠে পিছু ফিরে তাকিয়েছি কখনো-বা যেন কারু ডাকে!
যেন বা দেখেছি, রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ছে একটা মুখোস,
বারান্দায় খেলা করছে বাচ্চা মুখোসেরা,
ধবধবে শোবার ঘরে জীর্ণ কিন্তু পরিতৃপ্ত দুইটি মুখোস।

মুখোসের ছেলেরা মুখোস, মুখোসের মেয়েরা মুখোস,
মুখোসের মা ও বাবা জন্ম দিচ্ছে কেবলই মুখোস।

মুখোসের দেশে নেই জন্মনিয়ন্ত্রণবিধি পালনের কোনো প্রয়োজন?

শিশির ভট্টাচার্য (১৯৩২)

রৌদ্রময় দ্রুত দিনগুলি

রৌদ্রময় দ্রুত দিনগুলি,
অশেষ পেরিয়ে দ্যাখো—
একে একে কাছে আসে, উদাসীন চলে যায় দূরে।
যেন বহু ঘুরে,
পরাহ্নে নিঃসঙ্গ ট্রেন, আলোজ্বলা স্মৃতির স্টেশন—
তারে দোলে মাছরাঙা, বিলে বক, ডাহুক ডাহুকী আনমন
অকস্মাৎ আসে কাছে একে একে দূরে চলে যায়;
ফুলন্ত যৌবনগুলি বয়স্ক ইচ্ছার ভারে বাঁকাপিঠ যেমন নোয়ায়
ঘনিষ্ঠ সূর্যের স্থিরে, মাটি ভেজা ঘামে,
কিংবা মধ্যযামে—
বহু ধান কাটা হাত, কাদা জলে অসাধ্য লাঙল
কেন্দ্র থেকে দিগন্তে ফেরায় মুখ
কেন্দ্রাতিগ এ কোন অসুখ!
একে একে কাছে আসে, উদাসীন দূরে চলে যায়।
আমার স্বপ্নের পাখি শোণিত প্রবাহে তবু ওড়ে
আলোড়িত অস্থির ডানায়।

মায়া বসু (১৯৩৩)

রঙের পুতুল

যতই ভাঙো, আর যতই গড়ো
আমি আর কোনদিনও প্রতিমা হব না।

নরম তুলতুলে, একতাল কাদার মতন,
আমার সমস্ত সত্তা আর অস্তিত্বকে একাকার করে,
আর কখনো তোমাকে মূর্তি গড়তে দেবনা।

তোমার রুচি অভিরুচি কামনাবাসনা সুখ দুঃখ দিয়ে,
তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছে অনিচ্ছে দিয়ে
তোমার নিজস্বতাকে তোমারই মনের মতন করে
আর কখনো তুমি আমাকে
একটা রঙের পুতুল বানাতে পারবে না।

আর কখনো তুমি আমাকে তোমার পসরায় সাজিয়ে নিয়ে,
হাসি কান্না রাগ অনুরাগ, ভালবাসা না বাসার
হাটে বাজারে
অথবা চিত্রিত সংসারের কোন পণ্যশালায়
ঘুরে ঘুরে, ফেরি করে করে বেড়াতে পারবে না।

তোমার বিচিত্র দুর্বোধ্য জটিল অনুভূতিগুলোকে
আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে,
প্রত্যেকদিন আমাকে ভাঙবার আর গড়বার
কোন সুযোগই আমি আর তোমাক দেব না।

আমার আমিত্বকে—স্বকীয়তা স্বতন্ত্রতাকে—
সবকিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে
যে মূর্তিতে তুমি আমাকে রূপান্তরিত করেছ,
সে তো আমি নই!

তাই, তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বজ্রকঠিন পিঞ্জরে
আমি আর পোষা পাখি হবনা।
সব শাসন বন্ধন সব শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে
ক্রমাগত ধাবমান বিহঙ্গের মত আমি
উড়ে উড়ে চলে যাব —
দিকসীমাচিহ্নহীন, বাধাবন্ধহীন অন্য এক আকাশে,
যেখানে তোমার স্বেচ্ছাচারী অহঙ্কারী নিষ্ঠুর হাত
আর কোনদিনই আমার নাগাল পাবে না।

সাধনা মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪)

ফুলের মতো নয়

তুমি আমার সঙ্গে
ফুলের মতো ব্যবহার করো না
আমার শরীরে মলমূত্র আছে
আছে থুতু আছে শ্লেষ্মা
বাজারের যে বেশ্যা
তার শরীরের যা যা উপাদান
আমার শরীরেও সেগুলিই প্রধান
তুমি তাই মিছিমিছি
পেলবতা করো না আরোপ
যে সমস্ত অন্ধকার ঝোপ
রোমাঞ্চকর মনে হয়
তাদের মধ্যে সত্যিকারের জেনো
নেই কোন লুকোনো বিস্ময়
ফুলের মতোই যদি
ভাব তুমি শুধু শুধু
কষ্ট পাবে বড় স্বপ্ন শেষে
তাই তুমি স্বাভাবিক হেসে
আমার খিদে ও তেষ্টা
করে নাও সহজে স্বীকার
লৌকিকের চেয়ে বেশি
কিছু জুটে গেলে দৈবাৎ
সেটাই বাড়তি লাভ
করব না আগে অংগীকার

রবীন সুর (১৯৩৪)

লটারি

পরমাণু ফাটিয়ে বের করেছো দানব,
গ্রহান্তরে পাঠিয়েছো নভশ্চর—
তাতে আমার কি ?

গত বছরের খরায় ঝল্‌সে গেছে বুক,
এ বছরের বন্যায় থুবড়ে গেছে মুখ,
তিলোত্তমা রাষ্ট্রসঙ্গে জমছে কত সুখ !

জীবন এখন জুয়া,
ভাগ্য ফেরায় জ্যোতিষী—
তাবিজকবচশনি
যা-শেখাবে তাইতো শিখি,
লাখ টাকার স্বপ্নে কিনি টিকিট,
লটারি লটারি !

তুষার রায় (১৯৩৫)

সময়

আমি নিজেকে হাল্কা করে এনেছি, এমন
যাতে করে পৃথিবীর ভার দেড় কিলোও অন্তত কম হয়
গড়পড়তা নিঃশ্বাসও আজকাল, কম নিচ্ছি এমন
যাতে মূল্যবান অক্সিজেন খরচ হয় কম,
নিজে চাকরি না নিয়ে সেখানে অন্য একটি লোকের
সুবিধে করে দেওয়ার জন্য
মশায় নিজেই নিজের পায়ের ধুলো নিই কখনো,

ইট কাঠ পাথর থেকে বোম্বেটে বজ্জাত ছুঁচো পর্যন্ত
অস্তিত্বকে স্বীকার ও ভালোবাসা সত্ত্বেও মশায়
ক্রুর মুখগুলো সাঁৎ করে অক্রুর দত্ত থেকে সরে যায়
কফি হাউসের দিকে, খড়মড় মাংস চিবোনো
গলায় বলে ওঠে, শালা কবি,
এরা কি বাক্কাস ? যারা অরফিকে মেরেছিলো
নাকি জগাই মাধাই, এই ভাবতে ভাবতে দেখি
সেই সঙ্গে ছায়া ছায়া রাজনীতিবিদ অধ্যাপক আর
মুখোশ খোলা বন্ধু, আসলে গুরগুর করে ওঠে সময়
সময়ের মধ্যে তারপোড়া গন্ধ হাওয়ায় গ্যাঁজলা ফেনা
সমস্ত বিশ্বাস-এর আগে অ বসিয়েছে কম্পোজিটার

তবু বাঁচার জন্য গোপন খাপে ভোজালি পুষতে
ভালো লাগে না, ভাবতে ভাবতে
লিফটে উঠতে সিঁড়িতে নামতে ভার কমাচ্ছি, এমন
যাতে করে পৃথিবীর ভার দেড় কিলোও অন্তত কম হয় ৷

সামসুল হক (১৯৩৬)

বাঁশরীকে

সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব হিসেবে
তুমি কেমন আছো বাঁশরী
'পাৎলুন-পরা মেঘ' বিষয়ে
মন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত কী জানালে

হ্যাঁ ভালো কথা
মায়াকোভস্কি-কে ডিসকোতে আনার ব্যাপারে
এলসা ত্রিয়োলে-কে কি কোনো চিঠি লেখা হয়েছে
আর তোমার সেই দশ বছরের সর্দিটা এখন কেমন

আমি এখন ছাতিমতলায়
একা-একাই শুয়োরের মাংস খাই
ত্রিকোণ ফ্রেস্কো-থেকে-বেরিয়ে-আসা
সতেরোটা চোলাইবেলুন
আমার মাথার উপরে উড়তে থাকে

এই বিষয়টা নিয়ে
একটা নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা কি
তোমার দপ্তর গ্রহণ করতে পারে না
জ্যাক লণ্ডন পদত্যাগ করেছিলেন বলে কি
তোমরা নিরুৎসাহ হয়ে থাকবে

রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৬)

কিছু দৃশ্য

লিনোকাট ছবি হয়ে রয়েছে আকাশ ওই ওদিকের মাঠে
মেঘেরা করে না আজ খেলাধুলা
এদিকে আসন্ন সন্ধ্যা নেমেছে বাঁশের বনে গৃহস্থের
বাড়ির বাগানে
ডোমকানা ভূত খোঁজে চোরা অন্ধকার—
পশ্চিমে ছবির মধ্যে মিশে যায় বেপরোয়া ঘোড়া
নীল জার্সি পরেছে সওয়ার—
এরকম কিছু দৃশ্য—এবং দৃশ্যের মধ্য দিয়ে অন্য কিছু
চোখের কর্ণিয়া ভেঙে যায়
তা দেখে চালাক বৃষ্টি হঠাৎ নিয়ম ভেঙে ভেজায়
পথের চিহ্নগুলো।

তখন ফুলের গন্ধ উৎসের সন্ধানে যায় কেশরের গর্ভ পার হয়ে
(গন্ধ যেন প্রজাপতি—প্রজাপতি উড়ে যায় প্রেমিকার বাড়ি)

লিনোকাট ছবি থেকে তাই ঝরে পড়ে কিছু মেঘের শরীর
তবু মেঘ জানে ছোট শব্দমালা—জানে কথা বলা—জানে
চোখের কার্নিস্বা ভেঙে কোন্ দৃশ্য ছুটে যায় ছবির ভিতর
ভোরবেলা গন্ধ কোন্ গ্রামে যায়—প্রেমিকার বাড়ি
কার নীল জার্সি উড়ে যায়।

বাসুদেব দেব (১৯৩৬)

নষ্টচন্দ্র

দগদগে ঘায়ের মত কেবলই ছড়িয়ে যাচ্ছে শহর
বুনো লতাপাতার মতো জটিল আত্মমুখী দূরত্ব
এই সময়ই তোমার কথা মনে পড়লো বুবুল
টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতেই ভুল ধরা পড়ে
একটা জং ধরা পেরেকের মত দুপুরের পিঠে
আমাকে কে পুঁতে রেখে গেছে
টের পাই ওদিকে সসপ্যানের ওপর মাখনের মত
গলে যাচ্ছ তুমি নিশ্বাসে নিশ্বাসে

এখুনি কিছু একটা করা চাই
টেনশনের চূড়ায় একটি দ্রুত চালাক স্বয়ংক্রিয় টাইপ মেসিন
খটখট করে ভাঙছে সংকেত
মস্ত বড় টেবিলের ওপর ঢাউস হয়েছে হেমন্ত আর ছাইদান
তলায় পড়ে আছে নষ্ট স্প্রীং বাদামের খোসা
এই আমার শহর, ভাঙা টিউবওয়েলের নিচে কুকুর

স্বয়ংপ্রভ নশ্বরতায় বড় সুন্দর তোমার অধঃপতন
এইসব এলোমেলো লণ্ডভণ্ড বিকলাঙ্গ জিনিসপত্রের মধ্যে
ইঁদুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের কয়েকটা দিন
এর মধ্যে আবার বৃষ্টির ফোঁটার মত কেন নেমে এলে তুমি
অবেলায়, নষ্ট হতে ?

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত (১৯৩৭)

সেই ব্যথাটা মনে করুন

মনে করুন মধ্যরাতের ট্রেন চলেছে দ্রুততালে
দম নেওয়াটা হয়তো হবে একশো কি. মি.
মধ্যরাতের গতিরাগে দ্রিমি দ্রিমি
ট্রেন চলেছে দ্রুততালে মনে করুন

মনে করুন চুলগুলি তার উড়ছে ঝড়ে
পাশে বসা নিদ্রাতুরা সেই কিশোরীর
শরৎরাতের আলোর জোয়ার বিছায় শরীর
উথাল পাতাল ঢেউগুলি সব দিচ্ছে উঁকি
জানলা জুড়ে
আলোছায়ার কাটাকুটি আঁকিবুকি
কামড়া জুড়ে

মনে করুন
একাই আপনি নিদ্রাবিহীন
দৃশ্যাবলী আলোর বেগে পালায় দ্রুত
পিছন পানে ছুঁড়ছে কেউ-বা অবিরত
সব মিলিয়ে কিছু একটা যাচ্ছে ঘটে
মনে করুন

রাতের গাড়ি দম নিয়েছে একশো কি. মি.
গতিরাগের ছন্দ বাজে দ্রিমি দ্রিমি
সেই ব্যথাটা বলতে চাইছে কী যে করি
মনে করুন সেই ব্যথাটা বুকের মধ্যে
কাকে এখন ডেকে বলি

শালের বনে জ্যোৎস্না এখন দিচ্ছে উঁকি
রাতের গাড়ি পেঁছে যাবে পাহাড়তলি

সেই ব্যথাটা বলতে চাইছে কী যে করি
রাত্রি জুড়ে ঘুম নেমেছে, হায় কিশোরী
মনে করুন সেই ব্যথাটা বুকের মধ্যে

কাকে এখন ডেকে বলি
ডেকে বলি ।।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭)

ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম

ফেটে যায় বাদামের খোলা
নির্ভুল অঙ্গুষ্ঠ ওঠে নামে
তর্জনীর বৃত্তাকার কঠিন শরীরে গেঁথে যায়
অদৃশ্য অপেক্ষমান জোড়চিহ্ন ঘিরে।
দু' আঙুলে নিম্নমুখী তীব্র চাপ, নাকি ক্রোধ ?
মস্তিষ্ক মন্থন করে নেমে আসে প্রান্তিক পেশীতে
রুদ্ধশ্বাস ভূপ্রকৃতি—ফেটে পড়ে নির্বাক
বাদাম।

হাত, নাকি প্রাচীন অ্যাটিলা ?
পাঁচটি স্তম্ভের মত দুর্বিনীত শিলা
ফুলের পাপড়ির ছলে ভুলেও কখনও
চন্দন করে নি নষ্ট, পরায় নি কোন
রক্তটিকা।

ভঙ্গিতে নাশের মুদ্রা—কয়েকটি আঙুল
প্রসিদ্ধ গঙ্গার তীরে ভেঙে যায় অনন্ত
বাদাম।

তুলসী মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭)

রাত দশটায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো কারুকাজ নিয়ে
সুচিত্রা মিত্র হয়তো নিদারুণ ব্যস্ত এখন
পৃথিবী তোলপাড় করে
হয়তো একটা শব্দ হাতড়াচ্ছেন সুভাষ মুখুজ্যে
ফেলুদা কিংবা নতুন কোনো ছবির সংলাপে
সত্যজিৎ রায় হয়তো মগ্ন আছেন
কোনো বিপ্লবী হয়তো
দুনিয়ার চেহারা পাল্টাতে তৈরী করছেন গোপন দলিল...
রাত দশটা এখন—
হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ-মানুষী
নিশাচর ইঁদুরের মতো
ইতিমধ্যে, দেখুন, কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে
ডাস্টবিনে ছাই-এর গাদায় নালা নর্দমায়
নিশাচর ইঁদুরের মতো
হাজার হাজার মানুষ-মানুষী খুঁটে তুলছে অমূল্য জীবন।

হাজার হাজার মাইল ভারতবর্ষ জুড়ে
হাজার হাজার বছর এমি চলেছে—
হাজার হাজার বছর এমি চলেছে।

স্বস্তি মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭)

সেলাইকল

সন্ধ্যায় কে যেন এসেছিল বরাকর থেকে, বলে গেছে,
আবার আসবে, আট তারিখে, সকালেই, যেন থাকি।
পার্থর পৈতে মার্চের চার, যেতে হবে।

তপন ও সবিতা কার্ড দিতে এসেছিল,
মিঠুর বিয়ে সামনের বুধবার ।
অমরেশবাবু চিঠি দিয়েছেন : চেক আপের জন্যে
এ মাসের চৌদ্দ থেকে ষোল কলকাতায় থাকবেন ।

হিমঝরার মতো কেবলি দিন, একেক তারিখ,
যেন ক্যালেণ্ডারে চাঁদমারি ।
কাঠবেড়ালীর মতো তরতর করে
মগডালে উঠে যাচ্ছে রোদ ;
ছাপান্নটা পাকা চুল তুলে টুপুর বলে,
'দ্যাখো মা, বাপি কত বুড়ো হয়ে গ্যাছে ।'
ভাবছি, চব্বিশে রবিবার, তেইশে ও ছাব্বিশে ছুটি
মাঝের পঁচিশে একটা সি. এল নিলে দিব্যি...... ।

মাঝরাতে একেক দিন অদ্ভুত একটা সেলাইকলের শব্দ শুনি :
সুতোর বদলে তারিখ, তারিখে তারিখে কে যেন
সেলাই করছে আমাকে, নোতুন পুরনো কাপড়ে
ফুটো ফাটায় দিচ্ছে তালি ।
মনে আছে, কাল রাতে, ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগেই
তুমি বলেছিলে, তোমার সব মনে থাকে, সব তারিখ,
শুধু ভুলে যাও একটা দিন,
বছরে একবার, মাত্র একবারই যা' আসে ।
ববিনে সুতো জড়িয়ে ছিঁড়ে যেতে মনে পড়ে,
মনে পড়ে যায়, আজ বিশে জ্যৈষ্ঠ, আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী ।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮)

একটি শ্লোগানের জন্ম

আমি তো রাইফেলের গুলি নই যে সটান ছুটে যাবো—
ঢোঁড়া সাপ, আমাকে এঁকে বেঁকে চলতে হয়।
যতই এ-গলি ও-গলি করি না কেন
আমার লক্ষ্য কিন্তু বাদশাহী সড়ক,
অবশ্য আমরা যখন পেঁছিব তখন সেটা আর বাদশাহী থাকবে না,
বাদশাহরা তার আগেই ইতিহাসের পচা ডোবায় পেটফোলা
কোলাব্যাঙের মতো
চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকবে।
ফলে, পদ্ধতিটা বুঝে নেবার জন্য দেয়ালগুলোর উপর
নজর রাখতে হয়,
কারা কখন কীভাবে কেন লিখছে এবং কী লিথছে
কারা মুছে দিচ্ছে এবং কারা তাবৎ মোছামুছি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে
আবার লিখছে, সবই আমাকে মুখস্থ করতে হয়।

যখন দেখি, 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' তখন বুঝতে পারি
বিষয়টা সহজে হবার নয়। কিংবা যখন দেখি অমুকচন্দ্র তমুককে
ছারপোকা মার্কা বাক্সে ভোট দিন, তখন বুঝতে পারি বাক্সের আড়ালে
মস্ত কল্লা এবং কৌশল আছে। অথবা যখন অধ্যয়ন করি—
'এশিয়ার মুক্তিসূর্য জিন্দাবাদ' তখন রাস্তার মোড়ে একটা ভিখিরির
বাড়ানো হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি এই দু'নম্বর মুক্তিসূর্যের দিকে
ভুরু কুঁচকে তাকাই—ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে চোখ পুড়ে যায়, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়,
কিন্তু ঝলসানো তামার থালার মতো আকাশ আমাকে
মুক্তির কথা কিছুই বলে না।

যখন পড়ি, 'কমরেড কানু সান্যালকে জেল ভেঙে ছিনিয়ে আনুন'—
তখন ভাবি এঁরা অন্যের উপর দায়িত্ব দিয়ে
চলে গেলেন কেন? কিংবা আলকাতরা এবং ব্রাশের নৈশসংঘর্ষে

যখন দেয়ালে ফুটে ওঠে, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' তখন
ক্ষমতার আগে 'রাজনৈতিক' শব্দটা নেই বলে আমি আঁতকে উঠি এবং
খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং চিন্তা করতে করতে বার তিনেক
হোঁচট খেয়ে, একটা গুঁতায়মান ষাঁড়কে ধাপ্পা মেরে
সেই সারি সারি ভাঙা টালির ঘরগুলোর সামনে এসে দাঁড়াই ॥ এবং
সমস্ত নিস্তব্ধ উনুন, নর্দমার গড়ানো নোংরা জল, পচা গোবর,
বিচুলির বোঁটকা গন্ধ, আর কানে-আঙুল-দেয়া খিস্তির বান
এড়িয়ে এ-গলি ও-গলি করে শেষ পর্যন্ত পল্টুদের দরজায় এসে
কড়া নাড়ি ; কিন্তু খুব সূক্ষ্ম দরকার থাকা সত্ত্বেও পল্টুকে পাই না—
তা'র নাকি দুটো-দশটা ডিউটি ।

পল্টুকে পেলাম না বলে আমি অতিশয় মুষড়ে পড়ি এবং
হতাশ হতে হতে পৃথিবীর সমস্ত শ্লোগানের অর্থ এবং
অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে যখন মনে মনে তর্ক ক'রে একমত হই এবং
আলবেয়ার কাম্যু কিংবা বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের নায়কের মতো
আমার ফোকলা অস্তিত্বের বিলকুল গহন প্রদেশে যখন
মহান শূন্যতার রুচিকর ঘনঘটা দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং
আমি ক্রমশ রাতের হাওড়া ব্রিজের মতো বড্ড একা কিংবা অভিমানী
শুশুকের মতো
ডোবা-ভাসা হয়ে যাই—ঠিক সেই সময়ে
একটা খোলার ঘরের বারান্দায়
ঠাণ্ডা উনুনের পাশে
দু'হাত কোমরে রেখে
খাটিয়ার উপর ডান পা তুলে দিয়ে
গনগনে রাগ এবং কান্নায় ফুঁসে-ওঠা একটা আট-দশ বছরের
ডলঙ্গ ছেলে
গুলমার্গ থেকে বিবেকানন্দশিলা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপিয়ে দিয়ে
ভারতবর্ষের সমস্ত দক্ষিণবাহিনী নদীকে
বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে
সমস্ত অস্ত্রকারখানা বিমানবন্দর, সমস্ত বেনামী জমির দলিল

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া, যৌনসাহিত্যে আগুন লাগিয়ে দিয়ে
বিশাল পর্বতমালা জলস্রোত মাঠ-ময়দানের সমস্ত
খরশান জমায়েতকে তিনটে শব্দের মধ্যে স্তব্ধ ভয়ঙ্কর তোলপাড় ক'রে
খাটিয়ার উপর লাথি মারতে মারতে তার
সুকেশিনী ধূর্ত সৎমাকে চিৎকার করে বললো—
'ভাত দে হারামজাদী'।

অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯)

রন্ধন শিল্প

রন্ধন একটা শিল্প
তার জন্য চর্চা ও অনুরাগ দরকার
প্রস্তুতি-পর্বটি আমি লক্ষ্য করি

প্রথমে তুমি মুরগিটির মুণ্ডু ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চেপে ধরলে
বাঁ হাতে দুটো ঠ্যাং সমেত শরীরটাকে টেনে ধরে
ডান হাতের ছুরি দিয়ে গলার নিচে কুচুস
ছটফট করছে করুক ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে
রক্ত বেরুচ্ছে বেরুক মাটি শুষে নেবে হাত পা ধুয়ে নেবে
ছাড়বে না সহজে ছোটরাও ভয়ঙ্কর হতে পারে শেষ সময়েও
ছিটকে দূরে চলে যেতে পারে
রক্ত ছিটিয়ে নষ্ট করতে পারে তোমার শাড়ি আর প্রসাধন

এবার মুণ্ডুটা কেটে ফেললে
কোন ক্ষতি নেই ওদের জগতে শরীরটাই দামি
আমরাই শুধু চোখ মুখ মুণ্ডু নিয়ে মুণ্ডু ঘামাই
এবার গলার কাছ থেকে টান দিয়ে ওর শায়া শাড়ি সব খুলে ফেললে

কি অসহায় ছোট প্লাস্টিকের শরীর !
এর ভেতরে এত ছটফটানি ছিল, আওয়াজ ছিল ! আশ্চর্য !

কাটতে শুরু করলে হাত, পা, বুক, পেট
পেট চিরতেই একটা ডিম—হলদেটে লালা
ওর পেটে পেটে এত ছিল ! শিখেছিল যাবতীয় কুকর্ম
ওর পাড়ার সেই ছেলেটা পাশের খাঁচা থেকে ক'ক করে উঠল
তুমি তাকিয়ে থাকলে খয়েরি রঙের (স্ত্রী-অঙ্গের দেয়ালের মত)
কলজেটার দিকে
লোভে আর হিংসেয় তোমার চোখ দুটো চক চক করছিল

এর পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে
তোমার বগলে ঘাম স্তন দুটো ওঠা নামা করছে
হাতে রক্তমাখা ছুরি
লাল লাল লম্বা আঙুল তুলে আমার দিকে এগিয়ে এলে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? একটু জল দিতে পার না ?

আমার মুণ্ডু ঘুরে গেল, গলার কাছে চিন চিন করছে
দিচ্ছি, জল দিচ্ছি

আনন্দ ঘোষ হাজরা (১৯৩৯)

সংখ্যার পরীরা

বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে কাঁটা ও কম্পাস হাতে
একদিন উড়ে আসতো সংখ্যার পরীরা
ডানায় বৈদিক ছন্দ ; বর্ণময় পটে
ফুটে উঠতো অনাবিল ছবি আর ক্রম

১...২...৩...৪...৫...৬...৭...
অপরূপ যাদুদণ্ডে আনন্দের সরল জ্যামিতি।

এখন কঠিন হাতে শিক্ষক ডাস্টার
মুছে নেয় ছবি আর রঙ
জটিল অংকের খেলা, ক্রুর হাসি, কালো মেঘ, বিদ্যুতের কশা
সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, নক্ষত্র নিভেছে
ছন্দহীনতার মধ্যে বিশৃঙ্খল সংখ্যার উদ্বেগ
৪...৭...৫...৩...৬...২...১...
ভাঙা কাঁটা কম্পাসের স্তূপ জুড়ে বিশ্লিষ্ট শরীর
শুধু কাঁদে বিষণ্ণতা স্বর্গীয় এ সংখ্যার পরীরা।

উত্তম দাস (১৯৩৯)

বাতাস সমুদ্র খায়

সমুদ্রে এলে কারো শরীরে তেজ বাড়ে
কারো শরীর ফিনফিনে পালক
সমুদ্রে এলে সবাই বাতাস খায়
পাঁচশ গ্রাম বাতাস খেলে
শরীর ক্ষুধার্ত হয়
সমুদ্রে এলে শরীরে তেজ বাড়ে
কারো শরীর ফিনফিনে পালক
সমুদ্রে এসে আমি বাতাসকে
আমার শরীর খাইয়েছিলাম
আমার শরীর খেয়ে বাতাস ক্ষুধার্ত হয়েছিল
দেখে এলাম আঁচড়ে কামড়ে বাতাস এখন সমুদ্র খাচ্ছে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০)

ঘাতকের প্রতি নিবেদন

আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চল
প্রার্থনা করি না মার্জনাপত্র
শরণ্য দেবতা
মুঠোয় ধ'রে আছ যন্ত্রণার নিরাময়
সকল সম্ভাবনার সীমান্ত
দেখ, হৃদয়ে যেন মেঘ না জমে
করুণা দুর্বলতা
তোলা থাক্ জননী আর সন্তের জন্যে
তুমি ঈশ্বরের মতো পাথর
অরণ্যের মতো হিংস্র
আহত সাপের মতো ক্রোধ—সমুদ্রকে উত্তাল ক'রে তোলো

ফুটন্ত বিষ ঢেলে দাও শিরায় শিরায়
চোখের মণিতে রোমকূপে
যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করতে করতে
ক্রোধান্ধ ময়ালের জঠরে মিলিয়ে যেতে চাই

নীহারিকামণ্ডল সৃষ্টির প্রেরণা শিরায় শিরায়
প্রতিযোগী ঈশ্বর হ'তে চাই নই বিশ্বামিত্র
নেই অর্জিত তপোবল স্বশরীরে করি স্বর্গারোহণ
তাই ত্রিশঙ্কু
শূন্যতা চিৎকার করছে চারপাশে
আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চল
হে করুণাময় ঘাতক কর করুণা
ধর্ষণের তৃষ্ণা গর্জন করছে শিরায় শিরায়

সৃষ্টির উল্লাস

আমি অসহায় বীর্যহীন খোজা প্রহরী
আহত দন্তহীন সাপ
ফুঁসতে পারি দংশনের নেই ক্ষমতা

সুন্দরী কবিতা সম্রাটের বাহুবন্ধনে সহজে দেয় ধরা
দ্বাররক্ষী আমি
ক্ষুধার্ত চোখ মেলে প্রহর গুণি
ফুটন্ত বিষ কপাল থেকে চুইয়ে পড়ে মুখে
নামে গলায়, বুকের হাড় দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে
সম্রাটের হাতের চেটোয় নৃত্য করে কবিতা
প্রভু!
বধ্যভূমির পরিণতিই আমার প্রার্থনা!

দেবী রায় (১৯৪০)

আমি জোর হাতে, ক্ষমা ক'রো

বনশ্রী, ব্লাউজের টিপকল খুলে মন্দিরার আওয়াজ শোনাবে না?
বনশ্রী, বড়ো ভালো লেগেছিলো সেদিন বডিজের হুক খুলে দিতে:
ছোটাছুটি এই জীবন
এই জীবন সাদামাঠা
এই জীবন রিহার্শাল
বড়ো ছোটো এই জীবন
এই জীবন
এক জীবন
অভিজ্ঞতা অর্জনেই ফুরিয়ে যায়

ইদানীং রোজ সকালে আমার মাথা ধরে
কান্না পায় রাত্তিরে
আমারও মৃত্যুর দূরত্ব ৯৫ কিলোমিটার
বজ্রসহ বৃষ্টিপাত, মনে পড়ে কেন বজ্র, বৃষ্টি অসময়
বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের ভিতর নিবিড়, সতর্ক অন্ধকার
কেন সমস্ত জীবন জুড়ে এতো ক্রোধ, আমি ক্রোধ ?
কেন এই বিপুল রক্তের মধ্যে ভয়াবহ ডেকে ওঠে বজ্রমেঘ
তৃষ্ণা ও হাহাকার কেন এতো বিশাল ব্যাপক
মাথা হেঁট হয়ে আসে কেন এই নীরব অন্ধকারে
কেন নিত্য গুমরে-মরা কেন নিত্য অলক্ষ্যে হাতড়ে ফেরা
কেন অন্ধপথ, পায়ের নিচে পিছলে যায়
দারুণ কুয়াশায়
প্রতিহিংসা কার ? ভিক্ষুক, সর্বস্ব হারিয়ে আমি জোড়হাতে আজ
ক্রুর-কৃতঘ্নতা ; অন্তত আজ ক্ষমা ক'রো
আমি জোড়হাতে, ক্ষমা করো
ক্ষমা
ক্ষমা
বনশ্রী, আমার হাত ধ'রো—
কংক্রিট ফুটপাত, পায়ের নিচে পড়ে থাক
গা-ঘেঁষে, ভিড়—মিছিলের স্রোত মনুমেণ্টের নিচে
অথবা, অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত ময়দানে যাক
মহাশূন্যে, সর্বনাশ হোক এই নিচু পৃথিবীর

বনশ্রী, আমার হাত ধ'রে টেনে তোলো
প্রাকৃতিক ও নিয়ন জ্যোৎস্নায় ভিক্টোরিয়া
মেমোরিয়াল যায়—ভেসে যায়
মানুষের পুলিশের চোখের আড়ালে অধৈর্য ভালোবাসা
আমি কাঙাল, লুট ক'রো
শরীর শরীরের বিনিময়ে হোক পক্ষপাতহীন
সহাবস্থান

ভুল

ভুল

ভুল

শরীর! শরীর!

বনশ্রী, তোমার জটিল মন কে চেয়েছে?

এক তুমি-ই জানো—

তিরস্কার পুরস্কারে, আমি নির্বিকার

তুমিই জানো—

আমি নির্বিকার, সম্মান—অপমানে

লুটোপুটি দীঘার ঢেউয়ে জ্বেলেছিলে—ফসফরাস

তুমি আগুন

বনশ্রী, আমার হাত ধরো...

বনশ্রী, ব্লাউজের টিপকল খুলে মন্দিরার আওয়াজ শোনাবে না?

কেতকী কুশারী ডাইসন (১৯৪০)

বর্ষামঙ্গল

দীঘল পাহাড়ে বর্ষার ঢল,
ফুটে ওঠে খর নদী;
প্রপাতে প্রপাতে ধ্বস্ত উপল,
ছন্দ লক্ষপদী।

শূন্যের নাকি দেহ নেই! তবু
আপনি নিরেট ছিলো!
শেষে দ্রব হয়ে রটে কলঙ্ক,
হাওয়ারা খবর দিলো!

মেঘে ঢাকে শিলা, শিলা হয় মেঘ
নাটের রূপান্তরে :
ব্যস্ত রোদসী ঝাড়ে কেশরাশি
সহিষ্ণু চরাচরে।

ভাঙে জটিলের মণ-গড়া বাঁধ,
ডাকে সহজের বান,
কোন্ কৈলাসে সাধনাবিলাসে
উপবাসী অভিমান !

ভেজে তপোবনে চূড়ায়িত থোকা,
পিছল পাথুরে সিঁড়ি ;
মৌতাতলোভী প্রৌঢ় মালীর
জ্বলে না সিক্ত বিড়ি !

সেতারের তারে মরচে পড়েছে,
গলাব্যথা গায়িকার ;
প্রকৃতি তৈরি, মানুষই রাখে না
ঋতুর অঙ্গীকার !

উপত্যকায় উপচায় হ্রদ—
নন্দিত গর্ভিণী—
জলের জঠরে জপে মহাকাল
'জৈমিনি জৈমিনি' !

পুষ্কর দাশগুপ্ত (১৯৪১)

তার—যা আমার বা তোমারও—জীবনকাহিনী

একদিন তার জন্ম হল।
তারপর থেকে

সে বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল শৈশব থেকে কৈশোর কৈশোর থেকে যৌবন যৌবন থেকে প্রৌঢ় বয়স অব্দি

বাঁচতে চেয়ে

সবসময় অসহায় বোধ করে চাকরির তাঁবের তদারকে মান ইজ্জত খুইয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রায় গলাধাক্কা খেয়ে রেশনের লাইন দিয়ে কেরোসিনের লাইনে কয়েক ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে কালোবাজারে জিনিস খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে হাসপাতালে ভর্তির জন্য মাথা কুটে নেতাদের হাতে পায়ে ধরে ট্রামে-বাসে-ট্রেনে জানোয়ারের মতো যাতায়াত করে

বাঁচার চেষ্টা করতে করতে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল

তবু
বাঁচতে চেয়ে

মাথাগোঁজার জায়গা খুঁজে সেলামি আর বেশি ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালার তাড়া খেয়ে ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তির জন্য সবার কাছে হাত কচলে মেয়ের বিয়ের দাবী মেটাতে ধারদেনা করে ফতুর হয়ে ছেলের চাকরির জন্য ঘুষ দিতে হবে বলে কাবুলির কাছে ধার নিয়ে পাড়ার মস্তানদের অপমান নীরবে হজম করে পুজোর চাঁদা দিতে নাজেহাল হয়ে লোডশেডিঙে সি এম ডি-এর গর্ত করা রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে বাড়ি ফিরে হাজার মশার কামড় খেয়ে

বাঁচার
চেষ্টা করতে করতে বাঁচার

চেষ্টা করতে করতে বাঁচার প্রাণান্তকর
চেষ্টা করতে করতে

অবশেষে
একদিন সে মারা গেল

কমল তরফদার (১৯৪১)

আঁশ

আঁশের নিচে থাকে গরিমা, আঁশের হাসি
ঝকঝক করে দর্শকের চোখে !
এই রকম আঁশ তো পাখিরও হয়,
মাছ কিংবা বিড়াল ।
সব একই কথা
সামান্য পরিবর্তনে গায়ে লেপটে থাকে
অহংকার
যা ঝকঝক করে দর্শকের চোখে ।

বিড়াল মাছ খায়, বিড়াল বসে আছে চেয়ারে ;
পাখিরা উড়ে যায়, পাখির ডানা রয়েছে চেয়ারে ;
এবং তার কথাবার্তা মাছেরই বুড়বুড়ি ।
যুবতীর হাত বুঝি ডানা অথবা থাবা,
গায়েতে আঁশ আছে, নিচেই গরিমা,
সাঁতার কেটে কোথায় যায়, কোথায় ?
এদের কি থাকে নিষ্ঠা, প্রেম থাকে ?

মুচাচা এরমোসা ঘরে কথা বলছে

আগুনপারা রং

বুক এবং গ্রীবা এবং বাহু

আঁশের নিচে গরিমা

তোদো পারা তি

তোদো পারা মি ?

রমাপ্রসাদ দে (১৯৪২)

আজ অবধি

ফি বছর
পনরই অগস্ট
বাজার থেকে মাংস আনতেন আমার দাদা।
সেই ছেলেবেলায় আমি ভাবতাম
স্বাধীনতার স্বাদ মাংসের মতো।

এখন বড় হয়েছি
ধারণাটা তবু বদলায় নি।
এখনও মনে হয়
যাদের ঘরে ম-ম করছে
মাংসের সুঘ্রাণ
শুধু তারাই স্বাধীন।

জনগণের জন্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে
মন্ত্রীমশাই নিজের জন্যে যে বাড়িটা বানালেন

তার সিঁড়িতে দুরুদুরু পা রেখে
আমি একদিন মাংসের গন্ধ পেয়েছিলাম।

মন্ত্রীমশাই টুকরো টুকরো মহামাংসে
কাঁটা-চামচ রেখে
স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করেন।

শুধু মন্ত্রী কেন
ভুঁড়িদার অনেক মহাজনের
আকাশ-ভবনের রান্নাঘরে
আমি একই সুঘ্রাণ উড়তে দেখেছি।
ড্রইংরুমে
প্রশ্নাতুর টেলিফোন :
শ্রমিক উৎপাদন কেমন হচ্ছে ইদানীং
সোসাইটির ফ্যাক্টরিতে ?
কিংবা তার ট্র্যাক্টরে কৃষক চাষ ?...

এঁরা মহানুভব
দেশের জন্যে বানিয়ে দিয়েছেন টেকসই ক্রাচ।
১৯৪৭-এর পর থেকে আজ অবধি
ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে ভারতবর্ষ।

শান্তনু দাস (১৯৪২)

মধ্যাহ্নের ব্যাধ

আমি আছি :
পিঠে তূণ, ছিলায় আঁঠালো রক্ত অনন্ত অনাদিকালে
পাঁশুটে রক্তিম।

মা আমার দয়াময়ী জননী সুন্দর,
তুমি কোন্ তাম্বুলে আলোর কোলে ফেলে দিয়ে চলে গেছ
সোনার বাছাকে,
যে আলোতে ফোটে ফুল
ভোরের শিশিরে ঝরে স্মৃতি,
যে আলোতে রাতের অতিথি হাঁটু গেড়ে
নতজানু,
নির্মম শিবিরে এসে মহাকাল
দাঁতে কাটে আলোর করাত।

ভয়?
কাকে ভয়?
ভয় আমি কাউকে করিনা।
আমার শরীর দ্যাখো তামাটে ইস্পাত
হাতে খুন,
বনের গন্ধে যদি কখনো আচম্ব ঘুম নেমে আসে,
তবু জেনো—
চৌদিকে সতর্ক হাত,
পিঠে তূণ, ছিলায় আঁঠালো রক্তে পাঁশুটে রক্তিম।

পিতামহ:
সার্থকপূর্বক,
তুমিও কি ভয়ঙ্কর শাখাপ্রশাখার ঝাড়ে তুলেছো তুফান?
তুমিও কি মধ্যাহ্নের স্বর্ণছায়া দু'পায়ে মাড়িয়ে
মিশে আছো
গভীর নৈঋতে?
কিংবা কোনো লক্ষ্যভেদে দুরন্ত শার্দুল পিঠে
আদিম উল্লাসে ঘোরো দিগ্‌ভ্রান্ততায়
রক্তঝরা ললাটে আঁকড়ে নিয়ে স্মৃতি?

আমি জানি—
আমার ধমনী জুড়ে সেই শব্দ
পিতৃপুরুষের,
গরম লাভার স্রোতে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে বলে—
চরৈবেতি ।

কেউ কারে স্মরণে রাখে না :
শুধু মাত্র দৃশ্যপটে উত্তপ্ত পারদ ওঠে নামে,
নম্রতায় ঝরে পড়ে হলুদ পাতারা
কিংবা কোন তারা ঘর বদলে নেয় অন্ধকারে ।
শিয়রে দুঃখ নিয়ে
জ্বেলে রাখি চোখ,
যেমন বাঘিনী ঘোরে হেতাল বনের ধারে
ফেলে রেখে ঘুমন্ত শাবক,
সে আগুন আমার শরীরে
নিমেষেই দাবানল
নিমেষেই অনন্ত দহন ।

পিতা :
আমি আছি ।
যেমন সবাই নড়েচড়ে
আবহমানের কোনো স্মৃতি নিয়ে নিশ্ছিদ্র বিবরে
যেনো, তাই নয়
কিংবা কোনো লাভ-ক্ষতি তুলাদণ্ডে
নিজের শরীর থেকে আত্মগত প্রেম
তাও নয়,
আমার গোপন মূলে নেই কোনো স্বল্পক-বাসনা ।

হে পিতৃপুরুষ :
তোমরা শোনো

নিজের শোণিতে আমি খেলা করি মাছের মতোন ;
হে উত্তরসাধক :
আমি নতজানু তোমাদের কাছে ;
দয়াময়ী জননী সুন্দর :
জানিনা কখন তুমি তাম্বুল আলোর নীড়ে
ফেলে গেছ সোনার বাছাকে
শুনে যাও—
আমি আছি,
যৌবনের লাভাস্রোতে নির্মম আগুন নিয়ে বনজ মাটির কাছাকাছি,
পায়ে কাঁপে গর্ভিনী-মেদিনী,
পিঠে তূণ
ছিলায় রক্তের স্বাদে আমি এক মধ্যাহ্নের ব্যাধ
আদিম প্রহরে স্বতঃ ঋজু ;

ঋজুতম লড়াইয়ে সামিল ॥

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত (১৯৪২)

তান্ত্রিক

সামান্য কবির সঙ্গে সমুদ্রের সবুজ সঙ্গম
রাত দেড়টায়
কুকুরেরা পাশ ফিরে শোয়
নিরেট আকাশ তবু তখনো তেমনি উদাসীন ।

সামান্য কবির সঙ্গে সমুদ্রের নিপুণ সঙ্গম
রাত তিনটায়
মল্লিকা নামের নারী এ মুহূর্তে কত তুচ্ছ হয়

নিরক্ষর বাতাসেরা উড়ে যায় ঝাউয়ের উপরে
যথারীতি...

ব্রাহ্মমুহূর্তের পাখি টিউলিপ ফলের মত সূর্য ঠোঁটে নিয়ে
এসে পড়ে, দ্যাখে সৈকতে ঘুমায় কবি
ক্লান্ত মুখে এখনো তারার আঁকাজোকা
তন্ত্রসাধনায় যেন মগ্ন ছিল, সঙ্গে ছিল সমুদ্র ভৈরবী।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪২)

ভেড়ার সারি

সব এই ভাবেই
কাপে কফি চিনিতে চামচ পাইপে আগুন
শার্টে প্যাণ্টে বোতাম
আর লম্বা লম্বা পা

ঠিক এইভাবেই
ছোট ছোট পা   দরজায় কড়া
খিলের খুটখাট   শাড়ীর ফিসফাস
খোলসটা ছেড়ে
সমস্ত দাগ জলে ঘষে নিয়ে

তেমনি ভাবেই
রুটির সঙ্গে তরকারী
বিছানার সঙ্গে মশারী
তারপর
তারপর একটা
তারপর আরেকটা
তারপর আরেকটা

একটা সারি
আরেকটা সারি
আরেকটা সারি
আরেকটা   আরেকটা   আরেকটা

সন্তোষ চক্রবর্তী (১৯৪৩)

সুখদুঃখের কথা

সুখ তুমি কিনতে পারো। দুঃখ অত
সহজে মেলে না,
দুঃখ কারো ক্রীতদাস নয়।

সুখ তুমি বাঁধতে পারো। দুঃখ অত
সহজে থামে না।
দুঃখ কারো ইচ্ছানদী নয়।

সুখ তুমি আঁকতে পারো। দুঃখ অত
সহজে সাজে না।
সে বরং সাজায় তোমাকে।

সুখ তুমি ভাঙতে পারো। দুঃখ অত
সহজে ভাঙে না।
সে বরং তোমাকেই গড়ে।

ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালি হ'তে বলি

(শ্রী বিষ্ণু দে শ্রদ্ধাস্পদেষু)

গান হতে বলি আজ দীর্ঘশ্বাসগুলিকে আমার
সম্পূর্ণ লোকজ গীতি—ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালি-
দেশজ, ঐতিহ্যময়, লোকায়ত গীতিকার মতো।
মন থেকে মনে, মনে মনে, কৃষকের ঘরে ঘরে,
দুঃখ-বেঁধা হৃদয়ে-হৃদয়ে ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি
মধুর শীতল স্পর্শে সান্ত্বনার ঠাণ্ডা হাত রাখে।
সকরুণ সুরের মূর্ছনা সম্পূর্ণত দেশোয়ালি,—
নীরবে দাঁড়িয়ে পড়ে শোনে এক ভিনদেশী ভাই
আবেগে একাত্ম হয়ে এই গানে, স্বজনের গলা।
আত্মমগ্ন গায়কের ভরা, বিষণ্ণ, দরাজ গলা
ট্রানজিস্টারে—সুরের সুতোয় গাঁথে পরস্পর
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গ্রাম-জনপদ, যোগাযোগ ঘটে
আত্মায়-আত্মায়, নাগরিকে-গ্রাম্যজনে—গানে-গানে,
প্রাণে-প্রাণে, ভেদাভেদ ঘুচে যায় চাঁড়ালে-পণ্ডিতে।
সমৃদ্ধ লোকজ এই গীতি শিক্ষাভিমানীর মন
থেকে উৎপাটিত করে সঙ্কীর্ণতা, লোকলজ্জা, গ্লানি।
নাগরিক চেতনায় পরিশীলিত মননে, মনে—
অনিদ্রারোগীর চোখে, মস্তিষ্কের কোষে-কোষে
ফুলের পাপড়ির মতো অতি দ্রুত, ঘুম নেমে আসে,
বনে যায় নেহাৎ সরল গেঁয়ো, অভিভূত চাষা
ভুলে গিয়ে উপার্জিত ঔচিত্য অভ্যাস—আবেগের
উত্থান পতন ঘটে দেশোয়ালি সুরের সহিত,
উত্থানে-পতনে। যেন সে-ও নাগরিক, চলে যায়
মোষের গাড়ির সাথে, উচ্চাবচ, নিধুয়া পাথারে—

মইষাল ভাইসম।—কিম্বা সে-ও পাড়ি দিল খুব
দীঘল পানির পথ : ভাদরের ভরা-বর্ষা তার
চোখের সম্মুখে থৈ থৈ জলে ভেসে থাকা গ্রামগুলি
সবুজ শস্যের মতো জেগে থাকে, সুখ-স্বপ্নময়।

এদিকে গ্রামের সব ছেলে-বুড়ো যুবা গান শোনে
গ্রাম্য গায়কের কণ্ঠে—নিজেদের জীবনের গান ;
সুরের বন্যায় ভেসে যায় নতুন নৌকোর মতো
আষাঢ়ে-শ্রাবণে ; ভরা-ভাদরের জলের আদরে।
সহজ সরল সেই গেঁয়ো গায়কের ভাটিয়ালি
সুরের বৈভব রঙিলা বাদাম তুলে উড়ে চলে
স্রোতের উজানে, সমতল জলের উপরে দ্রুত
সঞ্চারিত হয়ে বিশাল বিস্তৃতি পায় চেতনার
পরিধিমণ্ডলে। এই গান মানুষে-মানুষে বাঁধে
মিলনের আবশ্যিক সেতু, অর্থময় করে তোলে
প্রাত্যহিক জীবন-যাপন। বয়সের ভারে নত
বৃদ্ধেরও জীবনে কিছু অর্থ যোগ করে দিতে পারে ;—
সঙ্গীতের আছে সে-ক্ষমতা। জীবনে আবার স্পৃহা
ফিরে পায় পরাজিত, পর্যুদস্ত সংসার-সৈনিক।
থেমে যায় হত্যায় উদ্যত হাত, মুহূর্তেই তার
শিথিল মুষ্টি থেকে খসে পড়ে খুনীর ভোজালি।

মননের মন্বন্তরে এই গান খাদ্যদ্রব্যবাহী
অসংখ্য জাহাজময় সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে।

নদীর দুকূল ছেপে উপচে পড়ে দেশোয়ালি সুর,
লোকায়ত আত্মার নির্যাস।—উচ্চাবচ পথে-পথে,
নদীর উষর বাঁকে-বাঁকে ঝরে পড়ে সুর-সুধা।
পরম আহ্লাদে ঝরে যেন নদীতে পাড়ের মাটি।

পলির মতন গান—ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালি
প্রলেপে-প্রলেপে ভরে অনুর্বর মনের মৃত্তিকা।

নিষ্ফল ক্রন্দন নয়,—দীর্ঘশ্বাসগুলিকে আমার
তাই গান হতে বলি—ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালি

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩)

জীবনানন্দের কাক

ও কাক, জীবনানন্দের কাক,
উড়ে তুমি এসেছো শরতে, ১৯৭০-এ,
শাদা ভাঙা ফুটপাতে আমাদের বাড়ির সুমুখে।

এতো দিন ছিলে তো ভালো বাংলাদেশের পাড়াগ্রামে
রোজ-রোজ নীলাভ আকাঙ্ক্ষায়-চড়া ঊষারও অগ্রদূত,
ও কাক, ও রাজভিখিরি,
কেন এলে মরতে শহরে,
কেন এলে ফের বাংলাদেশের সপ্তম দশকে,
এসে কেন ভবিষ্যৎ-বাকসে বসলে ?

একদিন চুকেবুকে গিয়েছিলো সব :
আকাঙ্ক্ষা ও পরিত্রাণ—
ট্রামে-কাটা জীবনানন্দের কণ্ঠ থেকে
গলগল রক্তের সঙ্গে তুমি এসেছো বেরিয়ে
ফুটপাতে আমার সঙ্গে দেখা হতে বিনীত বলেছো :
এতো দিন কোথায় ছিলেন ?

'শরতের খুব মধ্যে টেঞ্চ কেটে ঢুকে পড়তে চাই'
—তুমি জানো—
কেঁদে যায় বুকের পিয়ানো :
'শরতের খুব মধ্যে টেঞ্চ কেটে ঢুকে পড়তে চাই'
সে-কথা লুকাই,
তোমাকে জিগেশ করি : হে বন্ধু, আছো তো ভালো ?

—আজ, এই ঢাকা-র শরতে, ১৯৭০-এ
তড়িতে নিহত হ'য়ে ঝুলে আছো বৈদ্যুতিক তারে—
শরতে, ১৯৭০-এ,
ও কাক, জীবনানন্দের কাক ॥

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১৯৪৪)

মেশিন

একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা। পৃথিবীতে
মেশিন ভাই-বোন, মেশিন স্বামী-স্ত্রী ও মেশিন মা-বাপ
ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ। ওই,
একটা জাহাজ ভেসে উঠলো আবার সমুদ্রে, ওতে আসছে
নতুন আর এক ঝাঁক মেশিন ;
তুমি চেয়েছিলে কোলের ওপর
ছোট্ট এক হাতের হাত নাড়া, যা আমি এতদিন কিছুতেই
দিতে পারি নি তোমাকে,
আজ ওই নতুন মেশিন থেকে এসে, সে
তোমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কি
তোমার কান্নাও

আমি দেখতে পাই না আর, শুধু শব্দ হয় ঠক ঠক,
চোখ থেকে হাতের ওপর
পাথর গড়িয়ে পড়ে। শুধু শব্দ হয় ঠকাস ঠকাস, আর
একা এক রোবোট হেঁটে যায় আমাদের চারদিকে। ওই,
সে টিপে দিচ্ছে
সুইচ, এক্ষুণি আমরা আবার হাত-পা নাড়বো, ঘুষি পাকাবো,
কাজ করবো কাজ, তারপর যখন ফুটবে মেশিনের ফুল,
তুমি দ্রুত
তৈরী হয়ে নিও, আমরা ঘুরে আসবো মেশিনবৌদির বাড়ি।

কালীকৃষ্ণ গুহ (১৯৪৪)

লেনিন জন্মশতবার্ষিকীর অর্ঘ্য

বেদনায় ও প্রতিবাদে আমাদের ফসলের ক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন
একজন মানুষ,
আমি তাঁকে লেনিন ব'লে জানি।

আমাদের দীর্ঘ শতাব্দীর ভিতর দিয়ে অবিশ্রান্ত হেঁটে যাচ্ছেন
একজন মানুষ,
আমি তাঁকে লেনিন ব'লে জানি।

আজ আমাদের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে, কৃষ্ণচূড়া গাছের
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
আমি এই শতাব্দীকে বুঝতে চেষ্টা করি!
আমার বলতে ইচ্ছে হয় :

'লেনিন, আমাদের বৈশাখের এই কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি তোমার,
এই নিশানগুলি তোমার।'

শামসের আনোয়ার (১৯৪৪)

এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা।

কোন বিদর্ভ নগরী আমার স্বপ্নের ভিতর জেগে ওঠে না
ইতিহাসে কোনো অর্থ নেই মূঢ়তা ও ভ্রান্তি ছাড়া
যে নারী আমাকে পথে বসালো তার ক্রুর হাসির ছাপ
লেগে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়
আমি জানি মানুষের কোনো উত্তরণ ক্লিওর আঁচলে বাঁধা নেই
এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখি না
নরম বৃষ্টির মধ্যে একান্ত দুঃখিত লোকের মত আমি
মাথা নীচু ক'রে হেঁটে যাই
গুলি না খেয়েও আমার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে
ফেঁসে যাওয়া হৃৎপিণ্ড দুহাতে চেপে ধ'রে আমার
রোজ রাতে বাড়ি ফেরা
পদধ্বনি মৃত্যুর মতন অতি গম্ভীর বেজে ওঠে ও দূরের ফুটপাথের দিকে
চ'লে যায়
নিঃসঙ্গতার কাছে এরকম ফিরে আসার নামই যদি ইতিহাস
তবে আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানি
বীতশোক অশোক বা টায়ার সমুদ্র পারে কোনো প্রাসাদের খবর
আমার জানা নেই
আমার বিছানার পাশে বনলতা সেন নয় কোনো এক জলজ্যান্ত
পাপিয়া বসুর মণ্ডুকের মতো দুই স্তন ওৎ পেতে থাকে
শস্তা তেলের দুর্গন্ধে বিদিশার নিশা খুঁজতে গিয়েই আমি
অপ্রতিভ হেসে ফেলি
পায়ের নিচেই ক্ষুরধার রোদ, আমি বলতে পারি না আহা
বাইরে কি মনোরম বৃষ্টি

প্রেম আর স্মৃতি আমি উড়িয়ে দিয়েছি সিগারেটের ধোঁয়ায়
জ্বর আসে নি তবুও আমি জ্বরের ঘোরেই বাঁচি
মদের ঘোরে ভাঁড়ামো ক'রে আমার দুপুর কাটে
মাড়ওয়ারি দম্পতির নির্লজ্জ সংগম দেখে ছাতের ওপর
রাত্রির প্রহর পুড়ে যায়
ব্যর্থতা ও গ্লানির ক্ষুধায় হস্তমৈথুনের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েই
আমি পুনরায় ব্যর্থতা ও গ্লানির নিঃসীম তটে ফিরে আসি
খোলা ব্লেড দেখলেই তৃষ্ণায় আমার গলা জ্বলে
পাখার হুক দেখলে মনে প'ড়ে যায় সোনালি ফাঁসের কথা
এমন কি মায়ের মুখও চিনতে পারি না
মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, কে এই মহিলা
আমি এর শরীরের অংশ ছিলাম অথচ এর মনে নেই,
জানে না রোজ রাত দুটোর সময় আমার দুচোখের পাতা বেয়ে
তারই বুকের রক্ত ঝরে
মশারির পাশে ঘাতকের মতো চুপি-চুপি কে যেন এসে দাঁড়ায়
হাতে ছুরি অনিমেষ চোখ জ্বলে মুখের ওপর
বৃষ্টি আর কুয়াশার ল্যাম্প-পোস্টের নিচে বাইশ বছর
দাঁড়িয়ে আছি ভীষণ নিঃসঙ্গ
ঘাড় কাত ক'রে দেখে চলেছি দুঃখের যত কাটাকাটি খেলা
বৃষ্টি আর কুয়াশায় বাইশ বছর এরকম দাঁড়িয়ে থাকার পর
একদিন আমি ঘুমের মধ্যেই খুন হয়ে যাবো
এই বিমর্ষ ছবির নাম যদি ইতিহাস, তবে আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানি
যে সৃষ্টি আর সভ্যতা আমার বুকের বাইরে গ'ড়ে উঠেছে
তার প্রতি আমার বুকের কোনো মায়া নেই
কলকাতা আর আমার এই নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখি না।

নির্মল বসাক (১৯৩২)

এখনও সময়

লাল ঘোড়াটা আকাশ পথে তারার আলো মাড়িয়ে গেছে
মাটির বুকে উড়িয়ে গেছে অনেক ধুলো।
বুকের ভীরু স্তব্ধ খামার নুইয়ে পড়ে সাত সকালে
শিশির ভেজা বাতাস মুছে লজ্জা পাওয়া সূর্যটাকে—
আমরা উঁচু সেলাম ঠুকে তোমায় প্রভু মহামান্য,
বিষণ্ণতায় চেটেই খাবো অশ্বমেধের হবিষ্যান্ন !

নীল নিসর্গে স্বপ্নস্মৃতির ডুবো পাহাড় মুখোশ আঁটে :
স্বর্গী ঘোড়া জনসভায় রাখছে না আর ঘণ্টাধ্বনি
সন্ধ্যারতি, মৌন দেউল ;
সোনার পদ্ম, নুড়ি পাথর নগ্ননদীর উপকূলেই,
মগ্ন মদির অধিত্যকায় বরাভয়ের গোপন সিঁড়ি :
শ্বেত পালকে নষ্ট সময় উষ্ণ বুকের রক্ত মুছেই হাসবে হাহা !

তখন তুমি ইট পাথরের নকল স্বর্গ রক্ষা কোরো—
প্রভু, তোমার সমর্পণের নিশান ওড়ে !

বুকের মধ্যে ভোর কুয়াশা—এখনও তো সময় আছে
প্রভু, দগদগে লাল সূর্য ওঠার !

প্রদীপ রায়চৌধুরী (১৯৪২)

অসুখী মানুষ

কিছু কিছু শব্দ আলগোছে তুলে রাখি উঁচু কুলুঙ্গিতে
হরেক রকম ছবি গুছিয়ে রাখি বুকের তিন থাক গভীরে

দিনের বিশেষ কয়েকটাক্ষণ আলাদা করে সরিয়ে রাখি
পুরোন প্যাণ্টের পকেটে
ঠিক সময়ে ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে পারলে
তোমার আসার দিন আজও উৎসবের নহবৎ বসে

পৃথিবীকে ভাগ করলে তিন কিস্তি জল
আর এক ভাগে থাকে শুধু শস্য শ্যামলিমা
ভালোবাসাকে ভাগ করলে তেমনই সাড়ে তিন ভাগের বেশী দুঃ
আর ভগ্নাংশের সুখ
তবু দুঃখের টুঁটি ধরে আছি নশো নিরানব্বই জন্ম

দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের ত্রস্ত হাত যেমন সমুদ্রের পাড়ে
নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজে সন্তর্পণে নোঙর নামায়
এ জন্মের সোনালি যন্ত্রণা তেমনই রক্তের গভীরে নেমে
সুনিপুণ দাম্পত্য বাড়ায়
অথচ কবিতার প্রতিশব্দে দীর্ঘদিন তুমি ঘর বেঁধে আছ
তাইতো সুখের মতো সুখ পাবো বলেই
আমি বহুদিন অসুখী মানুষ হয়ে আছি

ব্রজ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪২)

অবিনাশ এবং আরো

ঘরে বইয়ের স্তূপ—গাঢ় অন্ধকার
দেয়ালের এক কোণে তার বাবার ছড়ি
তার মনে পড়ে হাসি খুশির খোলা পাতা
বাটিতে মুড়ি পাশে বেড়াল
মাদুরে বসে মাথা-থেকে-পা কাপড়ে মোড়া
যেন পাশ-বালিশ—পাশে রোদের মাদুর

অদূরে ভাত বসিয়ে শাক কুটছেন মা :
এখন গাঢ় অন্ধকার চোখে
বাড়িতে ট্র্যাস্‌পাসার আইনের ভয়ে রোদ ঢোকে না
দেয়ালে মায়ের ছবি
বাইরের দেয়ালে শ্লোগানের ছবি ;
কালকে যেন স্বপ্ন দেখতে চাও
ভাগ্যবাবু আসছেন একা বাস চালিয়ে
ঠিক তখন ঘুম ভাঙে
মাদার ডেয়ারীর দুধ হাঁকে—হাঁকে সাথে তার
আরেকজন চেয়ারে নতুন বেত লাগাবেন কেউ
এস অবিনাশ দেখছ নতুন ধারালো ব্লেড এল বাজারে
শার্ফিং-এর ছবি সমুদ্রের ধারে
অবিনাশ—বইয়ের স্তূপ—অন্ধকার
সেই ভাগ্যবাবু বাস চালিয়ে...আর...।

রথীন সেনগুপ্ত (১৯৪২)

প্রতিশ্রুতি

যারা বলেছিল হাতে তুলে দেবে আলোর ফুল
এখন তারা কোথায় ?
এই অবেলায়
করতলে ঝ'রে পড়ছে অন্ধকার,
'প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি' ধ্বনি তুলে ছুটে যাচ্ছে হাওয়া ।

কারা ঐ গোলাপ-বাগানে
সুন্দর খেলায় মেতে
একেক থাবায় নিচ্ছে তুলে মাংস একতাল
শুকনো জিভে চেটে নিচ্ছে মুল দ্রাক্ষারস

আতরজলে মুখ নিচ্ছে ধুয়ে
নরম তুলোর ওমে গড়াগড়ি দিয়ে
ভুলে যাচ্ছে অতীতের কথা ?

এই অবেলায়
'প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি' ধ্বনি তুলে শুধু
ছুটে যাচ্ছে হাওয়া...

সত্যাদেশ আচার্য (১৯৪৪)

জরদ্গব রাজার হাজার ছেলে

কাজ না করার অপবাদে নির্বাসনের ব্যবস্থা করলেন
প্রবীণ কয়েকজন সমাজবিদ ।
লুকিয়ে চুরিয়ে আমরা সবা   ভালমানুষ,
আপনারা সবাই জেনে যান
আমরা এখন আর বসে নেই ;
প্রতি সন্ধ্যায় ভূতনাথ মন্দিরে
বাবা ভোলানাথের নামে আড্ডা বসাই
কখনো পি. সি. চন্দ্রের দোকানে
ভাগ্যগণনা করে রত্নধারণ করি
এবং গাজনে বাবার ভর হলে জেনে নেই
আমাদের বংশের কুশলবার্তা ।

আমি নাকি জল ভরে খেতে জানি না ;
আপনারাই বলুন, জলভরা কি আমার কাজ ?
ঘরের দরোজা-জানালা বন্ধ করে অশ্রুপাত করি
কেননা
কান্না আমায় কাঁদায়
বঞ্চনা বঞ্চিত করে আমার সরল হৃদয় ।

আমরা এখন আর বসে নেই
বিপ্লবের ধ্বজা নিয়ে পুলিশকে ঠেঙাই
খুনি আসামীকে নিয়ে সিনেমা করি
জনজাগরণের মন্ত্রে গায়ত্রী হয়ে যাই এবং
বন্ধুত্বের বদলে প্রতিবন্দী হয়ে
ভিক্ষে চাই দয়া করুণা, মহানুভবতা...
এবং...
এবং...
আপনারা সবাই জেনে যান
আমরা এখন আর বসে নেই
বেকারত্ব ঘুচিয়ে—সর্বসাধনায় মৌনী

পঙ্কজ সাহা (১৯৪৬)

জাতক

মানুষকে মানুষের কথা বলতে দাও
সে কথা সরিৎসাগর
মানুষকে খুলে দিতে দাও
দু-হাট মানুষের জানালা
ওপারে সবুজ ডালে বসে আছে
ভোরের প্রথম পাখি
একটি ফুলের ওপর এসে পড়েছে
ধানরঙা রোদ
বনচ্ছন্দে উঠেছে মানুষের স্তব
সমুদ্রে পাহাড়ে আহা
ঘুরছে একটি গান
মানুষকে মানুষের কথা বলতে দাও।

ও কথা বলুক নিজের স্বরে
নিজের হাতে উড়িয়ে দিক
ঝকঝকে ডানার পাখি
আলোর রাখী বেঁধে দিক
সীমান্ত পেরনো পথে
মানুষকে মানুষের কথা বলতে দাও ॥

ওই যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে
দু হাত বাড়িয়ে মানুষ
উত্তাল সমুদ্রে ভাসছে
দুরন্ত মানুষ
মাটিতে বুনছে কবিতা
মানুষ
বাতাসে ছোঁয়ালো সোহাগ
মানুষ
দেখা হবার ভোরে
দুয়ার খুলে দিলো
মানুষ
মানুষকে কথা বলতে দাও
মানুষকে ভালোবাসার কথা বলতে দাও ॥

সুশীল পাঁজা (১৯৪৬)

হেঁটে যাব গ্রামের শরীরে

আমি ধূর্ত মানুষের বুক ছিঁড়ে দেখাবো সেই হিংস্রতা
শোনাবো মানুষের কথা
দুঃখের যন্ত্রণা অনেক চোখের জলে ভিজছে মানুষ
গ্রামের উঠোন

উঠোনে ছড়াবো আগুনের ফুল
ফুলের বিচিত্র ইতিহাস
নদীতে ভাসাবো নৌকো
কৃষকের শুষ্ক মাঠে ওড়াবো আমি
পাখিদের সবুজ আকাশ

আমি চোখের জলে কাঁদাবো না আর
মানুষের কংকাল সংসার
জীর্ণ বালকের হাতে তুলে দেবো রঙিন ঘুড়ি—
সাগরের পবিত্র জ্যোৎস্না
এটুকু—আমার হৃদয় আমার বিরাট বাসনা

শিশু ও মায়েদের বিষণ্ণ শরীরে
এনে দিতে পারি
সেই ফুলের বাগান আটপৌরে খড়ের চাতাল
এভাবে আমার শরীর নিয়ে আমি
হেঁটে যাব গ্রামের শরীরে...

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭)

বালক - পৃথিবীর গন্ধ

পচা সেই ডোবার কাছাকাছি জেগে থাকে বালক-পৃথিবীর গন্ধ,
শেওলা দু'হাতে সরিয়ে প্রথম জেগে ওঠবার মতো শিহরণ সেই মাটির
যেন ভিজে চুল এলানো নারীর স্নিগ্ধ হওয়া সহাস্য সকাল ;
উদ্ভিদের জন্ম নেবার মতো ইচ্ছা জাগে, কীটপতঙ্গের সেই ভাসতে থাকা সংসার
আশ্রয় খুঁজে পেয়ে মানুষ-মানুষ খেলবার অনভিজ্ঞ প্রয়াস

সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে ; শোনা যেত সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁ পোকার গলাসাধার রেওয়াজ
আজও শোনা যায়, তার ঠোঁটের ডগায় লেগে থাকে বালক-পৃথিবীর গন্ধ
পচা ডোবার কাছাকাছি তার সারা সন্ধ্যা স্মৃতি রোমন্থন
বায়ুবাহী ফুল ও বীজের কোটি বৎসরের উদ্ভিদ-উদ্ভিদ খেলা—

সুব্রত রুদ্র (১৯৪৭)

ডানার গুঞ্জরন

বাড়িতে থাকি আমি আর বুড়ো দেয়াল।
দেয়াল কিছু গল্প বলে আমাকে
সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে
আমি বুড়ো দেয়ালের চুলের মধ্যে ডুবে যাই।
দুই শাদা পরী গাছের মাঝখান দিয়ে
ধীরে ধীরে গাছের ভিতরে চলে গেল।
কোথাও কেউ কাঁদছে
আমি কোনোকালে সে-জবাব পাইনি।
একবার সেই পরীদের
ডানার গুঞ্জরন শুনেছি
একবার ভেবেছি
গাছ, তুমি যদি সত্যকালের গাছ,
আমাকে আশ্রয় দাও তোমার মধ্যে।

অভিজিৎ ঘোষ (১৯৪৮)

অনুভবমালা

সিঁড়ির
   ধাপে
      ধাপে
         নীচে
            নেমে
               দেখি
কেউ কোথাও নেই ; দক্ষিণের ফুলের বাগানে
ছায়া-উপছায়ায় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে
            সনাতন যৌন সম্পর্কিত
                  সবুজ ঘাস
                  শাদা শিশির ;
কেউ ওদের দেখতে পাইনি ;   ওরা সরে ছিলো অন্তরালে
দু'জনের একই কথাগুলি আলাদা সুর, ভিন্ন গানে
            বিভোর হয়েছিলো ।
         নক্ষত্র জগতের শব্দহীন ফুটে ওঠা দেখে
         মহাজাগতিক নীলিমার ধ্বনি শুনে
                  আমি বুঝি
         ফুল হয়ে ঝরে যাবে আমাদের উচ্চকিত হাসি ;
                  আয়ুভুক নশ্বরতা
                     নষ্ট করবে ক্ষণজন্মা প্রেম
         আমরা হারিয়ে যাবো ভুল নীলিমায়
                     সবুজ ঘাস   শাদা শিশির
                     দুলে দুলে   এই কথা বলে
                           সিঁড়ির
                        ধাপে
                  ধাপে
               নীচে
         নেমে
      দেখি
      কেউ কোথাও নেই ;   দক্ষিণের ফুলের বাগানে
      আমি একা...

শ্যামলকান্তি দাশ (১৯৫১)

ব্যাঙ

নীলাভ শ্যাওলা মেখে বসে আছে দুটি ব্যাঙ
অশথের ছত্রছায়াতলে—
এ ভরা বাদরে যদি ব্যাঙ বলতে স্পষ্ট হয়
তালকানা লোক
মানে প্রতিক্রিয়াশীল, হোক তবে তাই
পেছনে সমাজ নাই, মশাভর্তি কচুবন, সজ্ঞানে ষষ্ঠীবুড়ি
এখনো ঝিউড়ি
নেড়ামুড়ো ভাঙা ঘর
ঠুলিহীন রেবতীরমণ বসে তারই 'পরে গুড়গুড়ি টানছে—
দোল খাচ্ছে ফাটা মেঘে মড়াখাকী বাস্তুপাখি
বর্ণচোরা কুমুদবান্ধব
এদিকে যে লাইটহাউস ভেঙে দন্তবিগলিত
ঝিকুরগাছির অই দুটি ব্যাঙ মেসোপটেমিয়া যাবে
সমাজ আনতে
এই যাওয়া শাস্ত্রসম্মত

উহারা থাকুক সুখে, উহাদের ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৫১)

রোদ উঠছে চলো যাই

মাঠের ও প্রান্তে কারা ডাকলো,
রোদ উঠছে চলো যাই
বুনো মোষ ঘাস থেকে মুখ তুলে
মাথা নাড়লো, চলো যাই

নদী তার কবেকার চলা বন্ধ করে
ডেকে উঠলো, চলো যাই
চলো যাই চলো যাই,
হেঁকে উঠলো পুরনো বাতাস।

লাল লোহায় উদ্যত হাতুড়ি
হেসে বললো, চলো যাই
ঘাড় থেকে মাটিতে নেমে
লাঙলের তীক্ষ্ণ ফাল মাথা নাড়লো, চলো যাই
ঘরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দেখি
দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে ভোরের রোদ্দুর
জামা গেঞ্জি চটি ছাড়াই
আমি তার গলা ধরে দৌড়ে যাই প্রান্তরের দিকে।

করুণাপ্রসাদ দে (১৯৫২)

ইদানীং

ভাবছ কি
এক পা এগোই না
শুধুই পিছনে দু পা চলি ?
জানো না কি
আবাহনেই আমরা হাড়ি-কাঠের বলি ;
নাগরিক নব্যশ্বাস টেনে
দিনে দিনে
বড়ো জোর আমরা হুতোমী, আলালী !
আর কোথায়ই বা ঘুরি
হাজঙে, হাওরে, তিস্তায় করোতোয়ায়,—
খেয়েছি কি বিন্নি বাতাসা শালি চিঁড়ে আর মুড়ি ?

জাগরণ হাওয়ায়

জেগে জেগে কেমন ঘুমাই—
শুনতেও পায় না সোনা ভাই
নাইওর যেতে ছোট বোন কাঁদে দূরে—
দূরে আমরা সবাই
দূরে দূরে—
(ইজি চেয়ারে
বসে ভাবি, বুঝি কবিতা কেউ-ই না পড়ে)
ব্রাহ্মণ্য প্রলেপে
আর ইংরিজি লেপে
বেশ তো বাইশ জন সুখে নিদ্রা যাই,
মায়ের ছেঁড়া কাঁথা, আর—
একটু স্মৃতির চেতনায়—
মাঝে মাঝে সেই দূরে যাই
সোনাবোনের হাতের সেলাই
ইদানীং সযত্নে রাখি সংগ্রহশালায়।

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৪)

ধারাবাহিক

এখনো সে কথা হয়নি সেভাবে বলা :
সে কথা বলতে কেন যেন দ্বিধা জাগে,
পলাতক তিথি তবুও গেল না ভোলা
একটি স্মৃতির দুর্বল অনুরাগে।

কাকলি-মুগ্ধ নির্জন বনভূমি
মনে পড়ে পাশে নদীটিও কঙ্কণা,

প্রথম আলাপে দুটি করতল চুমি
রুদ্ধ আবেগে বলেছিলে 'ভুলব না।'

রাত্রি নিবিড় শৈবাল-সৈকতে
মহাশূন্যের গ্রহগুলি চেয়ে রয়,
আবেশ জড়ানো অনুভব কোনমতে
প্রাণ স্পন্দনে খোঁজে তার আশ্রয়।

রাঙা চেতনার নিত্য উপমা হোতেই
সংবেদনের ফুল ফোটে মনে মনে,
সুধা-সৌরভ নীরব-স্মরণ-স্রোতেই
একলা প্রহরে ভেসে আসে ক্ষণে ক্ষণে।

তাই বলছি যা বলিনি অঙ্গীকারে
দৃষ্টিও ধরা পড়েনি তো ইশারায়,
গোপনে হৃদয় গ্রহণ করেছে যারে
অধীর প্রকাশে কবে তার আসে যায়।

মুকুটে তোমার মণি-গৌরব জ্বলে
বুঝি মনে নেই সেই রাত সেই নদী?
এত সহজেই জীবন কি তবু ভোলে
দানের দেনায় আত্মা বিকোয় যদি?

আসলে কী চাই ভাবিনি কখনো তা-ও
মনে হোল তবু অপলক অগোচরে,
আবার কখনো মুখোমুখি যদি চাও
তার আগে যেন দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে।

দাউদ হায়দার (১৯৫৫)

যতীন বাগচীর চাঁদের মতো

যতীন বাগচীর চাঁদ বাঁশ বাগান ছেড়ে আমাদের ছাদের কার্নিশে উঠে এলো।
—লোড শেডিং-এর দিনে মাঝে মাঝে এইভাবে উঠে আসে, তখন
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্রে কবিতার হুলস্থুল, তখন

নদীর কোঁকড়ানো ঢেউয়ের সাথে জ্যোৎস্নার মিথুন লুকোচুরি, তখন
প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে অথই উৎসব খেলা, যেন নর্তকী, যেন
শ্রীমতী মল্লিকা সারাভাই মুদ্রা-ছন্দে ভেঙে ফেলছেন সমূহ তারার
ক্রন্দন এবং ঘাতক গোলাপের
দুর্নীতিমূলক স্বেচ্ছাচারিতা।

যতীন বাগচীর চাঁদ নয়, আসলে আমি দু'টি শালিক একত্রে
দেখবো ব'লে পৃথিবীর সমস্ত অলিগলি ঘুরে বেরিয়েছি।

একবার ভুবনেশ্বর থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ ট্রেন থেকে রূপনারানের
কূলে লাফিয়ে পড়লুম—

এ নশ্বর জল আদৌ সত্য কি না, আমি দেখে নিতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু
বালিরেখায় পাখির মাংস আর শিকারী মানুষের পদচিহ্ন দেখে
আমাকে অবাক ফিরতে হয়েছিল।

ফিরছিলাম। মাতৃজঠরের মতো অন্ধকার, ঘন কুয়াশা—
কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে আমার যাত্রা তখন পূর্বদেশে, আর এই
চোখের তারায় যতীন বাগচীর চাঁদের মতো উঠে এলো
অরুন্ধতী নাম্নী একজন ভদ্রমহিলা, কিন্তু আমার
গৃহের প্রত্যেকটি দরোজা তখন হাট ক'রে খোলা ;—না,
সেখানে কোন দু'টি শালিকের পদচিহ্ন পড়েনি কখনো !

ব্রত চক্রবর্তী (১৯৫৫)

কথা দিয়ে

সৌমেন ভয় পায় সীমা আশ্বস্ত করে
সীমা আঙুলের নখে এককণা ভবিষ্যৎ তুলে এনে
দ্বিধাগ্রস্ত হয়, জোরালো আঙুলের ধাক্কায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে
সৌমেন স্বস্তির গলায় সময়ের সার্জারির গল্প ব'লে যায়।
দু'জনের কারুরই রক্তে এমন যুদ্ধজয়ের ছবি নেই যে
নির্দ্বিধায়, একে-অন্যের অস্তিত্বের ওপর সেঁটে দিতে পারে ;
কিন্তু এ-ওকে শুশ্রূষা করার সময় দু'জনেই শক্তিমান ;
অদ্ভুত দক্ষতায় এ-ওর শৃঙ্খল ছিঁড়ে, ছেনে, মুক্ত ক'রে দেয়।

পৃথিবীর সমস্ত গাছের মতন ওদের নিজস্ব এক গাছ আছে
ওদের অজস্র, অনর্গল কথার সংঘবদ্ধ রূপ নিয়ে
সেই গাছের তলায় কিছু কিছু নুড়ি পড়ে আছে।
দু'জনেই রক্তে-নিহিত ঈশ্বরের অভিপ্রায় জেনে, ছড়ানো নুড়ির
মাঝখানে বসে, কথা বলে, হাসে, কথা দিয়ে সময়ের কারুকার্য করে।

সৌমেন শুরু করে, থামে, সীমা শুরু করে ;
সীমা মুখরিত হয়, থামে, সৌমেন শুরু করে ;
কথায় কথায়
ভারী-হওয়া জীবনের ভার দু'জনেই এইভাবে মুক্ত ক'রে যায় !

জয় গোস্বামী (১৯৫৬)

চাঁদ

প্রেতের ফ্যাকাশে মুখ দেখা দিলো বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভোররাতে
রাত্রিকে একবার যদি ধারালো সুন্দর হুলে বিঁধে তুলে নিয়েছিলে
প্রকাণ্ড ভিমরুল
তাহলে এক্ষুণি কেন ডানা থেকে ফেলে দিলে তাকে ? ওই অত
উঁচু থেকে
সে নিচে পড়ছে হুহু বাতাসের মধ্যে আমি সারারাত্রি ঘুমোতে পারি নি
সে নিচে পড়ছে টুকরো বৃষ্টিরা দুদিক থেকে সরে যাচ্ছে মারাঠা দুর্গের
মতো বাড়ির নিঝুম চিলেকোঠা
ফেরায়নি গোমড়া মুখ একবারও তলা থেকে, তবু তার ভাঙা ভাঙা
আলিসায় উঠে
নরক ফিনফিনে সাদা উড়ুনিটি পেতে দিলো হাওয়া ও আকাশ থেকে জলে
এত সুরাবাষ্প তবে কোথায় পালিয়ে ছিলে এতদিন ? আমি
যখন উদ্ভিদরূপে জলাজঙ্গলের মধ্যে থাকতাম তুমি ছোটো কলসি করে মদ
আমার পায়ের কাছে ঢেলে দিতে, ঢেলে দিতে সামনের জলার মধ্যে
তার নিচে কচ্ছপরা ঘুমোতো—

তাদের খোলায় যত কাটাকুটি আমি সব পড়তে পারতাম
আমার পাতারা খেতে ভালো কিনা সেকথা নরক লিখে রেখেছিল
অন্য সব গাছেদের কাছে
যেসব গ্রহরা ছিল বায়ুহীন আমি রোজ অক্সিজেন 'পাঠিয়েছি
তাদের সবাইকে, আজ বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভোররাতে
প্রেতের ফ্যাকাশে মুখ ভেসে উঠতে চেষ্টা করছে, হালকা চাদর দিয়ে তার
সারাদেহ ঢাকা তাও হাওয়াতে মেশানো দুই পায়ের ঝটকায়
মাঝে মাঝে মেঘ ছিটকে বেরোতে পারছিল, ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাড়ি
আটকে দিলো তাকে, বলো সুরাবাষ্প, তোমার যা-কিছু
ধাতু, হাওয়া বা আগুন
আগে তুমি সব গিয়ে বলে দিয়ে আসতে না চুল্লীর উত্তাপে ?
আমাকে একদিন মাত্র যেতে দিয়েছিলে ওর কাছে আর
সারা গা ঝলসে গেছে কিভাবে আমার
আমি শুধু জানতাম। শরীর পোড়ার সেই হুহু জ্বালা
একবার মাত্র এসেছিল
আতঙ্কে আকাশে জলে নিজেই বিছিয়ে গেল যে-মুগ্ধ নরক
বলো ঠিক, কখনো দ্যাখোনি তুমি এমন শৃঙ্গার !
দ্যাখোনি ভিমরুল, যার ধারালো সুন্দর হুলমুখে
রাত্রি এসে বিঁধে গেছে, এবং আনন্দে কাতরে উঠেছে নিজেই
হোক না একবার—তাও সেই কথা মনে করে আজ আমার সারাদেহে রোম
দ্যাখো দাখো, দাঁড়িয়ে উঠেছে। তুমি উদ্ভিদ কচ্ছপ কিংবা
নরম পতঙ্গরূপে আমাকে সৃষ্টি করে নাও
আর যদি পুরুষ করো তাহলে বনের মধ্যে চলে গিয়ে রাত্রিবেলা
তোমার নরম পেটে মাথা রেখে শোবো
তোমার থাবার স্বপ্ন ছাড়া কিছু দেখবো না, ভেবে যাবো
কখন বসাবে দাঁত আমার কণ্ঠায় !
আমার নলীর রক্ত যদি টেনে নাও, কাঁপবো, যদি রাজি থাকো
তবে মর্তে নেমে দেখবো একবার
নাহলে আবার ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাড়ির শিখরে
আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখা দেবে কাল